আট আনা সংস্করণ

[৬ষ্ঠ গ্রন্থ]

পুণ্য-প্রতিমা

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল,

প্রণীত

৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক্ ষ্টল্
৭৮।২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

'মানসী' প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
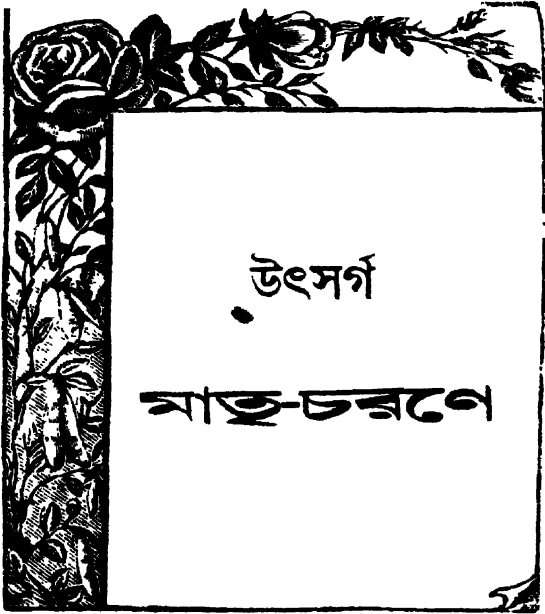
উৎসর্গ
মাতৃ-চরণে

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আমাদের আট আনা সংস্করণের ৬ষ্ঠ গ্রন্থ "পুণ্য-প্রতিমা" প্রকাশিত হইল, সুলভে সৎ-সাহিত্যের প্রচারোদ্দেশ্যে—এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে—ক্ষুদ্রশক্তি আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না,—এখন সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহদৃষ্টি ও শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা এতদুভয়ই আমাদের এই 'সিরিজে'র অক্ষয় কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

বিশেষ কারণ বশতঃ **"সমাজ-বিপ্লব"** প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবে তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ, মহাশয়ের মনোমদ উপন্যাস **"ময়ূরপুচ্ছ"** প্রকাশিত হইবে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গ এই পুস্তক-পরিবর্ত্তন-জনিত-ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই 'সিরিজে'র তথা বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। **কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, মাত্র**

পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভি, পি, ডাকে পাঠাইব এবং যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে তখন সেইখানি ভি, পি, ডাকে পাঠাইব। ইতি—

মিথুন-সংক্রান্তি
১৩২৪

পুণ্য-প্রতিমা

উপক্রমণিকা।

কৃষ্ণপুর কলিকাতার সন্নিকটস্থ একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস করেন। এছাড়া নবশাখ ও অন্যান্য জাতি আছে। রামতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এখানে চার পাঁচ পুরুষের বাস। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান, শুদ্ধাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যাজন ও পৌরহিত্য ইহাঁর জীবিকা। তাহা ছাড়া চার পাঁচ বিঘা লাখরাজ জমি এবং চার পাঁচ বিঘা খাজনার জমি জোতে বন্দোবস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একরূপ কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করেন। বাস্তুভিটার উপর ছোট খাট একতালা একখানি বাড়ীতে ইনি বসবাস করেন। বাস্তু-সংলগ্ন কতকটা পতিত জমি আছে তাহাতে

দুই চারটা আম গাছ নারিকেল গাছ লাউ কুমড়া ও অন্যান্য শাক সব্জীর গাছ আছে। অন্দরের খিড়কীর সম্মুখে একটি ছোট ডোবা তাহাতে গৃহকার্য্যাদি সমস্তই হইয়া থাকে। অর্থাভাবে বসতবাটীর বহু দিবসাবধি কোন সংস্কার না হওয়ায় উহা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবার মধ্যে একমাত্র পুত্র হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ও পুত্রবধূ লাবণ্যময়ী দেবী। লাবণ্যময়ী যথার্থ ই লাবণ্যময়ী। ঘর আলোকরা রূপ লইয়া লাবণ্য যখন নিজ পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে ঘর বসত করিতে আসিলেন তখন রামতনুর যেন একটা দায়িত্ব শেষ হইয়া গেল। রামতনুর স্ত্রী হৃষীকেশকে অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা করিয়া পরলোক গমন করেন। সতী-সাধ্বী মৃত্যু শয্যায় স্বামীর হাতে দশম বর্ষীয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলেন' 'বালকের ইহজগতে আপনার বলিতে আর কেহ রহিল না। তুমি তাকে দেখো আর উপযুক্ত সময়ে একটি সুন্দরী দেখিয়া তাহার বিবাহ দিও।" এই কথা-গুলি বলিয়া সাধ্বী স্বর্গে গমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই সময় সংসার ত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এই সংকল্পচ্যুত হয়েন।

বালক হৃষীকেশকে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লালন পালন করিয়া সদুপদেশ ও শাস্ত্রশিক্ষা দান করেন। পরে সুপাত্রী সুন্দরী লাবণ্যময়ীর সহিত বিবাহ দিয়া পুত্রকে সম্পূর্ণ গৃহী করিয়া রামতনু ভট্টাচার্য্য সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করেন। তার পর তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময় হইতে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল।

পুণ্য-প্রতিমা

—o—
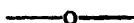
প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈত্র মাস। তপনদেব ধরণীকে প্রখর তাপে সন্তপ্ত করিয়া অস্তাচলে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পরই পূর্ণ শশধর পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া জগৎকে স্নিগ্ধ কিরণে আপ্লুত করিয়াছে। মন্দমন্দ সমীরণ বহিতেছে। এতক্ষণ পরে যেন প্রাণিগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। লাবণ্যময়ী সমস্ত দিবসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দাওয়ার উপর একখানা মাদুর বিছাইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া শুইয়াছেন। তিন বৎসরের শিশু সীতানাথ জননীর পার্শ্বে শুইয়া ক্রীড়া করিতেছে। জননী পুত্রের ছোট হাত দুখানি ধরিয়া "তাই তাই তাই মামার বাড়ী যাই" বলিতেছেন। শিশু মায়ের কথা শুনিয়া অমনি অনুকরণ করিতেছে "তাই

তাই তাই তাই মামা বাই দাই।” মাতা আকাশের চাঁদকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“আয় চাঁদ আয় আমাদের খুকুর কপালে টিপ দিয়ে যা।” মাতা খোকার কপালে টিপ দিতেছেন খোকা হাসিয়া আকুল। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধ আধ স্বরে খোকা বলিতেছে—“টি দিয়ে যা।” মাতা পুত্রে এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়া কথোপ-কথন চলিল।

তারপর মাতা শিশুকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালক সীতানাথ ভারী দুষ্ট কিছুতেই ঘুমাইবে না। মাঝে মাঝে বালক বলিতেছে—“মা! মা! আঁদা মামা।”

মাতা ধমক দিয়া বলিলেন—“হাঁ হাঁ চাঁদা মামা—তুই কি ঘুমুবিনি?”

মাথা নাড়িয়া খোকামণি বলিল—“মা! মা! ঘুমু না।”

মাতা পুনরায় ধমক দিয়া বলিলেন—“ঘুমু না বৈ কি? দেখবি—হুমোকে ডাকবো?” এই হুমো পাখীর প্রভাব বালকের উপর কতটা তা মাতাই জানিতেন। সেই কারণ, যেই হুমোপাখীর নাম শোনা অমনি সীতানাথ বিনা বাক্য ব্যয়ে চক্ষু বুজিয়া নিজ মাতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মাতা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর দুষ্টামী কর্ব্বি?”

শিশু—"না।"

মাতা "তবে ঘুমো।" অল্পক্ষণ পরে মাতা পুত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

পার্শ্বস্থিত গৃহ মধ্যে হৃষীকেশ সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া প্রদীপালোকে পুঁথি দেখিতেছেন। ইহা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া তিনি শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। আজও তাই করিতেছেন। রাত্রি যখন ১০॥ ঘটিকা তখন তাঁহার পাঠ সাঙ্গ হইল। হৃষীকেশ পুঁথি বন্ধ করিয়া লাবণ্যময়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন লাবণ্য নিদ্রিতা। দেহের বসন স্বল্প অসংযত ভাবে বাতাসের সঙ্গে কাঁপিতেছে। মস্তকের বদ্ধবেণী চ্যুত, কুঞ্চিতকেশদাম মৃদু সমীরণে নৃত্য করিতেছে কখন কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর আসিয়া পড়িতেছে, কখন বা কপালের উপর পড়িয়া মুখশ্রী বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। লাবণ্য গরীব ব্রাহ্মণের গৃহিণী; অলঙ্কার বস্ত্রের পারিপাট্য তাঁহার কিছুই নাই। হাতে শুধু শঙ্খ ও কামারের নোয়া। মস্তকে সধবার সর্ব্বস্ব সিন্দূরের রেখা লাবণ্যর সীমন্তের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হৃষীকেশ আকুল নয়নে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। "মরি

মরি! কি রূপ! এ কি আমার মত নিরন্ন ভিক্ষুকের কুটিরে শোভা পায়? সহস্র কোহিনুর যে আমার লাবণ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে। দয়াময় এ রত্ন আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু আমি যে ইহার মর্যাদা রাখিতে পারি না—ইহার মর্য্যাদা রাখিতে জানি না। লাবণ্য আমার এই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটিরে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে রাজরাণীর চেয়ে সুখে আছে বলিয়া মনে করে। সে ত এক দিনও আমার দৈন্য বা দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া কোন অভিযোগ করে না। সদাই হাস্যমুখী—সদানন্দময়ী আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ সংসার লইয়াই ব্যস্ত।" হৃষীকেশ স্ত্রীর শিয়রে উপাধান পার্শ্বে বসিলেন। একবার আকাশের শশধরের প্রতি লক্ষ্য করেন আবার ভূমিতলে ছিন্ন শয্যায় শায়িত ইন্দুমুখী লাবণ্যর প্রতি চাহিয়া দেখেন। কে বেশী সুন্দর? যতই রূপ দেখিতে লাগিলেন, ততই ডুবিলেন; যতই ডুবিলেন, ততই মজিলেন। তিনি ক্ষণেক বাহ্যজ্ঞান শূন্য। যখন চটক ভাঙ্গিল তখন বুঝিলেন যে তাঁহারই অজ্ঞাত চুম্বন স্পর্শে সাধ্বীর তন্দ্রা টুটিয়া গিয়াছে। স্বামীর অধিকার এইরূপ অজ্ঞাতসারে বিস্তারিত হইতে দেখিয়া লাবণ্য বস্ত্র সংযত করিয়া স্বামীর প্রতি অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"পড়া শেষ হলো কখন ? এখনও ব'সে আছ ? রাত হ'লো আমায় ওঠাও নি কেন ? খাবার সময় হয়ে গেছে যে ।"

তাঁহার অধিকার এইরূপ ভাবে অপব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ তিরস্কার না পাইয়া বরং স্ত্রীর সোহাগ-দৃষ্টি ও প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে হৃষীকেশ একটু অপ্রস্তুত হইলেন। উত্তরে বলিলেন—

"এতক্ষণ মদের নেশায় বিভোর ছিলাম, কাজেই অন্ন-ব্যঞ্জনের কথা মনে হয় নাই"।

"তা বেশ করেছ। এখন চল—খাবার দাবার যোগাড় করিগে।" এই বলিয়া লাবণ্য ভূমি শয্যা ত্যাগ করিলেন। পরে পুত্র সীতানাথকে গৃহমধ্যস্থিত শয্যায় শোওয়াইয়া স্বামীকে লইয়া রান্নাঘরে গেলেন। স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইলেন। তারপর তাম্বুল ও পানীয় জল স্বামীর শয্যা পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। হৃষীকেশ মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শয্যা অধিকার করিলে পর স্ত্রী স্বামীর পাতে বসিয়া ভোজন সমাপন করিলেন এবং তারপর স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রনাথ রায় কৃষ্ণপুরের জমিদার। জমিদারীর আয় অধিক না হইলেও তিনি একজন প্রতাপশালী লোক। লোকে বলে দেবেন্দ্রনাথের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী। বাৎসরিক দশ বার হাজার টাকার মুনফার জমিদারী লইয়া তিনি এত প্রতাপান্বিত। না জানি একটু বড় রকমের জমিদারী হইলে বোধ হয় তিনি হাতে লোকের মাথা কাটিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছেন। বিলাসিতার খরস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া তিনি ইহ সংসারে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। গৃহলক্ষ্মী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই স্রোতে বাধা দিবার একজন ছিলেন। এখন তিনি নিষ্কণ্টক স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হইয়াছেন। মদিরা, বিলাসিনী ও হিতাকাঙ্খী সুহৃদরূপ মোসাহেবের দল তাঁহার নিত্যসহচর। কলিকাতার বিখ্যাত বাইজী কৃষ্ণপ্রিয়া ইহার রক্ষিতা। তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদে প্রায়ই সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত করেন। মধ্যে মধ্যে কেবল অর্থ

সংগ্রহের জন্য নিজগ্রামে আগমন করেন। যে কয়দিন কৃষ্ণপুরে থাকেন সেই কয়দিন শুধু বাগান বাড়ীতে নাচগান ও মদের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। পল্লীবাসীরা ও তাঁহার দীন প্রজারা সদাই সশঙ্কিত—কখন কি দুর্ঘটনা তিনি ঘটান। আজকাল তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি হইয়াছে তাহাতে তিনি এই পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিলে যেন সকলেই আশ্বস্ত হয়েন। অনেক সধবা ও বিধবা সুন্দরী তাঁহার কুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাহাদের অমূল্যরত্ন হারাইয়াছে—ইহকাল পরকাল জলাঞ্জলি দিয়াছে। এ হেন দেবেন্দ্রনাথ একজন জমিদার—এহেন দেবেন্দ্রনাথ দেশের সমাজের একজন গন্যমান্য ব্যক্তি—জনসাধারণের নিকট বঙ্গের ধনীদের নিকট এমন কি রাজদরবারে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

আকাশে যেমন চন্দ্রদেবকে বেষ্টন করিয়া সহস্র তারকারাজি শোভা পায় তেমনি আমাদের দেবেন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া শত শত মোসাহেব শোভা পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ দেবেন্দ্রনাথের পুত্রের বয়সী, কেহ বা তাঁহার সমবয়স্ক কেহ বা তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সমসাময়িক লোক। এই বয়োবিভিন্নতা হইলেও স্থান কাল ও পাত্র মাহাত্ম্যে সকলেই এক জোটে এক প্রাণে একই

উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ যদি ইহাদের কাহাকে ধরিয়া আনিতে বলেন ইহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া আনে। এরূপ উপযুক্ত বিশ্বাসী বন্ধু অনেক তপস্যা করিলে তবে পাওয়া যায়।

আজ দেবেন্দ্রনাথের বাগান বাড়ীতে ভারী ধূম। তিনি সম্প্রতি কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা বাইজী কৃষ্ণপ্রিয়া দাসীর প্রেমে মজিয়াছেন। বাইজী আজ তাঁহার বাগান বাড়ীতে পদধূলি দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে কৃতার্থ করিবে বলিয়া বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। বন্ধু-বান্ধব সকলেই এক একটা কাজ লইয়া ব্যস্ত। কেহ বাগান বাটী সাজাইতেছে, কেহ ভাল ভাল মুখরোচক উপাদেয় আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেছে—তন্মধ্যে পেস্তা ভাজা, চিংড়ীমাছের কট্‌লেট্‌ মাংসের চপ, মটনের কারি, এই গুলিরই বিশেষ আয়োজন। কেহ বা মদের কেশ খুলিয়া বোতল, সোডা গ্লাস সাজাইতেছে। হরনাথ ভট্টাচার্য্য এই দলের একজন প্রধান নেতা। হরনাথ আমাদের রামতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। লোকে বলে হরনাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। হরনাথ ইদানিং নিজের নিষ্ঠা ও যাজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

জমিদার বাবুর দয়ায় তাহার অপেক্ষাকৃত কিছু আর্থিক উন্নতিও হইয়াছে।

বাইজী আব্দার করিয়াছে যে যেদিন সে দেবেন্দ্রনাথের বাগান বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিবে সেই দিনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহাকে বাইজীর উপযুক্ত একটী মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিতে হইবে। কাজেই কলিকাতার বিখ্যাত দোকানদার হ্যামিলটন কোম্পানীর নিকট হইতে হরনাথ দেবেন্দ্র রায়ের আদেশ মত পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিয়া একটি মুক্তা বসান কণ্ঠহার কিনিয়া আনিয়াছে। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ এই অলঙ্কার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে নিজের হিতাকাঙ্খী বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত বিশেষ গবেষণার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। পাঁচ সহস্র মূল্যের অলঙ্কার ভিন্ন কমদামের অলঙ্কার দিলে যে দেশের, দশের ও জনসমাজের নিকট জমিদার বাবুর মুখ হেঁট হইবে একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল।

বাইজীর আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। বৈঠকখানা ঘরে বন্ধুবান্ধব সকলেই সমবেত হইয়াছে। মণ্ডলাকারে সকলে দেবেন্দ্রনাথকে বেষ্টন পূর্ব্বক সুরা দেবীর উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রেই হরনাথের হস্তে গ্লাস দিয়া বলিলেন—

"খাওহে হরনাথ! একটু আগে জমি করে নাও। তুমি আজ বড় কষ্ট করেছ।"

হরনাথ হাত রগড়াইতে রগড়াইতে উত্তর করিল—

"আজ্ঞে বাবু! এত আমার সৌভাগ্য। আপনার কাজে আমার প্রাণ গেলেও আমি নিজেকে ধন্য ব'লে মনে করি। আজ্ঞে! হুজুর সোনা হারিয়ে কি আঁচলে গেরো দোওয়া চলে। আপনি আগে পথ দেখান। কথায় আছে —'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।"

দে—"ওহে! ওসব কিড়িং মিড়িং রেখে দাও। এই নাও ধর" বলা বাহুল্য ইহার উপর হরনাথ আর কোন উত্তর করিতে পারিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই জমিদার বাবু প্রদত্ত গ্লাস হস্তে লইয়া চম্পক-কুসুম-রাগ-রঞ্জিত পানীয় এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

দেবেন্দ্রনাথ "Bravo এই ত চাই" বলিয়া অন্যান্য পারিষদ বর্গকে উপাসনায় আহ্বান করিলেন। সকলেই একে এক পর পর আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রথম জমি তৈয়ারী হইল।

ক্ষণেক পরে উমানাথ সরকার বলিল—"ঢের ঢের বড়লোক দেখা গেছে বাবা, কিন্তু আমাদের বাবুর মত উঁচু নজরের লোক বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।"

"তা আর বলছ দাদা! তা আর বলছ" এই বলিয়া সকলেই একবাক্যে সরকার মহাশয়ের কথার পোষকতা করিল। তাহার পর বিপিন নেউগি বাবুর মনোরঞ্জনার্থে বলিল—"বাবুর মন ভাল কাজেই সব দিকে ভাল হ'চ্ছে। তা না হ'লে অতবড় বাইজী—যার জন্য রাজা রাজড়ারা পাগল—ওঁর দাসী হ'য়ে পায়ে লুটিয়ে রয়েছে।"

বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"নাও নাও নেউগি, মাংস চপ খাও। কে আছিস্‌রে—খাবার গুলো এদিকে নিয়ে আয়।"

হরনাথ নেউগি মহাশয়ের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া উত্তর দিল—"যে যাই বলুক অমন ভালবাসা কখনও দেখিনি। ঘরের পরিবারও অত ভালবাসতে পারে না। বিশেষ ভাগ্যবান পুরুষ না হ'লে অমন সুন্দরী বাইজীর অত অনুগ্রহ কি কেউ পায়?" তখন তিনকড়ি মণ্ডল উচ্চকণ্ঠে বাইজীর স্তুতি গাহিতে লাগিল—"দাদা! যদি বেশ্যার মধ্যে কেউ সতী থাকে তবে আমাদের এই বাইজী।"

সকলেই এই কথার সমর্থন করিবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঠিক বলেছ মণ্ডল দাদা! Three cheers for Baiji. Hip, Hip, Hurrah! Hip Hip Hurrah! Hip Hip Hurrah!

এই আনন্দ ধ্বনি শুনিয়া বাবুর বুক দশ হাত উচ্চ হইয়া উঠিল। তিনি পুলকিত প্রাণে দেয়াল সংলগ্ন দর্পণের মধ্যে একবার নিজের দেহকান্তির ও মুখশ্রীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইলেন ও নিজের গোঁফ জোড়াটিতে একটু মোচড় দিয়া লম্বভাবে টানিয়া দিলেন। মাথার টেরিটি ঠিক আছে কি না একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। পরে মজলিস ত্যাগ করিয়া একটু উদ্‌গ্রীব চিত্তে বাহিরে আসিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন।

হরনাথ ভট্টাচার্য্য বাবুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। পরে বলিল—"বাবু! বাহিরে রৌদ্রের তেজ এখনও রয়েছে। পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুরলে মাথা ধরবে।

একটু বিরক্তি সহকারে বাবু উত্তর দিলেন—"মাথা ত ধরেছে। আর ধরবে কি?

"কেন হুজুর! এ রকম হলো কেন? এতে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।" হরনাথের চক্ষু ছল ছল ভাব ধারণ করিল।

তখন মণ্ডল মহাশয় কাছে আসিয়া বলিল—তাই ত মশাই এত আমোদ সমস্ত বুঝি পণ্ড হয়। আমরা এত আশা ক'রে সবাই জমায়েত হয়েছি—

বাধা দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—“ওহে ভায়া সবাইকে দেখছি কিন্তু কারুকে দেখতে পাচ্ছিনি। শুধু তোমাদের—” হর—“তাত বটেই—তাত বটেই। আমাদের মত নীরেট পাথর গুলোকে নিয়ে কি আর হবে? তা হুজুর হুকুম দেন ত একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে ফটকের কাছে একটা মহা হৈ চৈ গণ্ডগোল উঠিল। “বাইজী এসেছেন! বাইজি এসেছেন।” অমনি যে যেখানে ছিল সকলে শশব্যস্তে উঠিয়া ফটকের দিকে ছুটিল। কেহ কসি গুঁজিতে গুঁজিতে কেহ কাছা আঁটিতে আঁটিতে কেহ গ্লাস হাতে লইয়া, কেহ নগ্নপদে, কেহ বা একপদে পাদুকা পরিয়া ফটকের দিকে ছুটিতে লাগিল। মৌচাকে আগুন লাগাইলে যেমন মৌমাছির দল চাক ছাড়িয়া আসে, গড়ের মাঠে তামাসা দেখিতে ব্যগ্র জনতা যেমন পুলিশ সার্জ্জেনের তাড়নায় যে যেদিকে পারে দৌড় দেয়—সেইরূপ সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া ফটকের দিকে দৌড় দিল।

দেবেন্দ্রনাথ একটু মুচকিয়া হাসিয়া পকেট হইতে এসেন্সসিক্ত রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে ফটকের কাছে গেলেন। বাবু যাইবামাত্র

সকলেই তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। বাবু গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাইজীকে তাহার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করাইলেন।

বাইজী অমনি সোহাগ মাখান সেতার মিশ্রিত ঝিঁঝিট খাম্বাজের সুরে বলিল—

"নমস্কার দেবেন বাবু! তোমাদের এই পাড়াগেঁয়ে বাগান এত দূরে; আর রাস্তাটা কি খারাপ। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আমার পেটে. ব্যথা ধরে গেল। আমার গা গুলিয়ে উঠছে।" এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তাত হবারই কথা। এ সব জায়গা কি আপনাদের যোগ্য।" এই বলিতে বলিতে কেহ পাকা লইয়া কেহ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কেহ চাদর নাড়িয়া বাইজীকে বাতাস করিতে করিতে আসরে আনিয়া বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে সারাঙ্গী. তবলজী, ওস্তাদজী প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই অবতীর্ণ হইল। ইহারা আদব কায়দা রাখিতে খুব পটু। উপযুক্ত সম্ভাষণ আদর অভ্যর্থনা আপ্যায়িতের পর একাধারে সঙ্গীতের তান ও মদিরা স্রোত ছুটিতে লাগিল। বাবুদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

দুই চারিটি গানের পর বাইজী তাঁহার ওস্তাদজীকে

চোক্ষের ইঙ্গিতে কি বলিয়া দিল। তখন ওস্তাদজী দেবেন্দ্র বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বাবুজি! আজ ত বড়া উন্দা গাওনা হুয়া। বিবিকো ইনাম মিলনা চাইয়ে।"

দে—"হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক!" বাবুর আদেশ ক্রমে হরনাথ তৎক্ষণাৎ সেই মণিময় কণ্ঠহারটি বাইজীর শ্রীপাদ পদ্মের নিকট রাখিয়া দিলেন। বাইজী ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া বদন সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—"এ সব জিনিস এখানকার মত পাড়াগেঁয়ে মেড়াদের গায়ে শোভা পায়। আমাদের মত কলিকাতার বাইজীদের খানসামার মেয়েরা এ সব পরে না। কি পছন্দ—বলিহারী তোমাদের পছন্দ দেখে।" এই বলিয়া এক পদাঘাতে কণ্ঠহারটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

বাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই কণ্ঠহার পাইয়া তাঁহার নূতন প্রণয়িনী না জানি কতই সোহাগ করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। কিন্তু এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া বাবু শশঙ্কিত ও হরনাথ ভয়ে জড়সড়। তখন বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—"তাইত—তাইত—হতভাগা ছোড়া হরনাথ পছন্দ করে এনেছে। আমি এখনও ভাল করে দেখিনি তা—তা—

তাতে আর কি হয়েছে—ওটা দয়া করে নাও আর একটা দিতেই বা কতক্ষণ।”

তখন সারঙ্গী বলিল—হাঁ বিবি! ইয়ে ঠিক বাত হ্যায়। বহুত মোনাসিব বাত হ্যায়। আউর একঠো আচ্ছা মিল যায়ে গা।

বাইজীর তখনও রাগ থামে নাই। সে রুক্ষস্বরে বলিল—“না না থাক্—এ আমার দরকার নাই। আমি যখন শচীন রায়ের কাছে ছিলাম সে আমাকে একবার শুধু হাসাবার জন্য বিশ হাজার টাকার সেলী কিনে দিয়েছিল। দুই বৎসরে আমাকে দু'লাখ টাকা দিয়েছে। ওরকম খেলো জিনিসে আমার হাত দিলে আমার অপমান হয়। যাক্, তোমরা যা ইচ্ছা হয় কর আমার দেহ বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।” এই বলিয়া সে মজলিস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থিত গৃহাভিমুখে চলিল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে ওস্তাদজীর প্রতি আবার একটু ইঙ্গিত করিতে ভুলিল না। ওস্তাদজী তখন সেই কণ্ঠহারটি গুছাইয়া তুলিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিল।

এত সাধে প্রমাদ ঘটিল। বাবুরও তখন দেহ খারাপ বোধ হইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মা মা—পায়ে লেগেছে—ছুমো মেরেছে।"—বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালক সীতানাথ মার নিকট ছুটিয়া আসিল।

"কি করে লাগলো বাবা?" বলিয়া মাতা লাবণ্যময়ী পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন পুত্রের বামপদ হইতে অবিরত রক্ত ছুটিতেছে।

মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া মাতাকে ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিয়া বালক কহিল—"মা মা—রক্ত পচ্চে।"

"হাঁ বাবা, রক্ত পড়ছে! কি করে পায়ে লাগালি? আহাহা রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে যে রে।"

মাতা যত রক্ত মুছাইয়া দিতে লাগিলেন রক্ত তত অঙ্গ বহিয়া ছুটিতে লাগিল। বালকের পদে বিশেষ কোন ক্ষতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। কেবল একস্থানে একটি বিন্দু পরিমাণ ছিদ্র নয়ন গোচর হইল। ক্রমে রক্তপাত কমিয়া গেল কিন্তু অতি অল্পক্ষণের মধ্যে বালকের অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল—বালক যেন একটা নেশার ঝোকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। তখন উৎকন্ঠিত হইয়া লাবণ্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"ওগো শীঘ্র এসো গো। খোকা কেমন কচ্ছে গো! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো।"

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। বর্ষাকাল। আষাঢ় মাস। হৃষীকেশ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যা আরতীর বন্দোবস্ত করিবেন এই সংকল্প করিয়াছেন এমন সময়ে স্ত্রীর ভীতিবঞ্জক কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন।

"কি হয়েছে? কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে। দেখ গো খোকা কেমন কচ্ছে। পায়ে কি লেগেছে বলে এই রকম ঢলে পড়লো গো।"

হৃষীকেশ মাতৃ অঙ্কে শায়িত শিশুকে সামান্য পরীক্ষা করিয়াই বুঝিলেন যে বালক ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীন হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে বালকের অঙ্গে সর্পাঘাতের পূর্ব্ব-লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে। ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন তার পরই "কি কল্লে মা শঙ্করী" বলিয়া বাটীর সদরে আসিয়া "সাধু! সাধু!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। হৃষীকেশের বাটীর পার্শ্বেই রমাকান্ত রায়ের জমি। রমাকান্ত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ইনি স্বনাম ধন্য পুরুষ। অতি গরিব অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।

তার পর ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া এক্ষণে জেলার জজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। তিনি কলিকাতা সহরে নিজের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তথাপি নিজের জন্মভূমি কৃষ্ণপুরের মমতা ত্যাগ করেন নাই। নিজের দেশে অনেক জমি ক্রয় করিয়া প্রজা বসাইয়াছেন। এখন তাঁহাকে এক জন সামান্য জমিদার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমাকান্ত উদার হৃদয় দাতা ও পরোপকারী। তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রী বহু গুণসম্পন্না। রমাকান্ত প্রায়ই বলিতেন যে তাঁহার গুণবতী স্ত্রীই তাঁহার উন্নতির মূল। অনেকগুলি সদ্‌গুণ তিনি নিজ স্ত্রীর সাহচর্য্য বশে পাইয়াছেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। সাধুচরণ রমাকান্তের একজন অনুগত প্রজা। সাধু একজন দীন প্রজা হইলেও পরোপকারকে একটি মহা ব্রত বলিয়া মনে করিত।

হৃষীকেশ 'সাধু সাধু' বলিয়া ডাক দিলেন। সাধু সারাদিন পরিশ্রমের পর নিজ কুটিরে আসিয়া একটু বিশ্রাম পূর্ব্বক সবেমাত্র আহার করিতে বসিয়াছে এমন সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উচ্চ আহ্বান তাহার শ্রুতি গোচর হইল। ডাক শুনিয়াই সাধু নিজ কন্যাকে উদ্দেশ

পূর্ব্বক বলিল—দেখ্ ত চাঁপা ভট্‌চায্যি মশাই বুঝি ডাকছেন'।

চাঁপা তৎক্ষণাৎ বাহিরের দরজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা? ভট্‌চায্যি মশাই?"

হৃষী। হ্যাঁ চাঁপা, তোর বাবা কোথায় রে?

চাঁপা। বাবা খেতে বসেছে। ডেকে দোব?

হৃষী। তাইত খেতে বসেছে তাকে একবার বল আমার বড় বিপদ। আমি কি কর্ব্বো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

একথা আর চাঁপাকে জানাইতে হইল না। সাধু উদ্‌গ্রীব চিত্তে কন্যার ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। যেই শুনিল ভট্টচার্য্য মহাশয়ের বিপদ অম্নি গৃহিণীকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিল "না! আর খাওয়া হলো না। ভট্‌চায্যি মশায়ের বিশেষ বিপদ না হ'লে এত উতলা হয়ে ডাক্‌তেন না। আমি উঠি—"

সাধুর স্ত্রী বাকি অন্নব্যঞ্জন খাইয়া যাইতে কত অনুরোধ করিল। কিন্তু সে কথা না শুনিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িল এবং অতি দ্রুত মুখ হাত ধুইয়া বাটীর বাহিরে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল—"কি হয়েছে বাবা ঠাকুর?"

হৃষীকেশ প্রথমে কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। সাধু শুধু দেখিল তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পঁড়িতেছে। দেখিয়াই বুঝিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমূহ বিপদ হইয়াছে নচেৎ তিনি এরূপ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবেন কেন? কিন্তু বিপদ যে কি প্রকার তাহা অনুমান করিতে পারিল না। সেই জন্য সাধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বাবাঠাকুর?"

"কি বলবো সাধু! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।" এই বলিয়া হৃষীকেশ উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে হৃষীকেশের অন্দর হইতে ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল। হৃষীকেশ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। পাগলের মত তিনি নিজ বাটীর মধ্যে ধাবমান হইলেন ও সাধু উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্দরে গিয়া সাধু দেখে লাবণ্যময়ী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চীৎকার করিতেছেন—"বাবা গো কোথা গেলি গো! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো!" আর মধ্যে মধ্যে নিজ বক্ষে করাঘাত করিতেছেন।

"কি কর মা জননী! কি হয়েছে দেখি?" এই বলিয়া বালককে ভাল রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সাধু পল্লীগ্রামের লোক। বয়স ৫০।৫৫ বৎসর

সে অনেক দেখিয়াছে। বালক সীতানাথকে দেখিয়াই সে বুঝিল যে কালান্তক যম তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। তখনই সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কাটি ঘা! এযে সর্ব্বনেশে বিষ ঢুকেছে দেখছি। মুখ দিয়ে লাল পড়ছে গা নীল হয়ে যাচ্ছে; হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হলো রে।"

হৃষীকেশ তখন সাধুর হাত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"সাধু! সাধু! আমার খোকাকে বাঁচাও—আমার সীতানাথকে বাঁচাও।" লাবণ্য সাধুর সম্মুখে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"বাপরে! তুমি তোমার ছোট ভাইকে বাঁচাও। ওগো সে যে আমার শিবরাত্রের শলতে! আমার অন্ধের মণি!"

সাধু আর অধিক বাক্যব্যয় করিয়া অনর্থক কালক্ষয় করা যুক্তি সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া একেবারে পশ্চিম পাড়ার কালীওঝার নিকট দৌড় দিল। অনতি বিলম্বে কালীওঝাকে সঙ্গে হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ওঝা অনেক প্রকার ঝাড় ফুঁক মন্ত্র তন্ত্র গাছ গাছড়া প্রভৃতির সাহায্যে বালককে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কোন সুফল ফলিল না। দেখিতে দেখিতে বালকের অঙ্গ হিম হইয়া গেল—হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া আসিল। মৃত্যুর

লক্ষণ সমস্তই উপস্থিত। নিয়তি কে খণ্ডন করিবে সীতানাথ আজ সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন! মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। নিবিড় অন্ধকার—কোলের মানুষ চেনা যায় না। কৃষ্ণ-পুরের উত্তরে ক্ষুদ্রতটিনী রেবতী কুল কুল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র তটিনী গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে পরিপূর্ণ হইয়া ইহাতে খরস্রোত বহিতে থাকে। ইহার সহিত দামোদর নদের সংযোগ আছে। এই কারণে বর্ষায় বর্দ্ধিত কলেবর ধারণ করিয়া রেবতী কৃষ্ণপুরের উত্তর প্রান্তকে ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়। গ্রাম্য পথ কৃষ্ণপুরের উত্তরপ্রান্তভাগ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরই এই তটিনীর কূল।

নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া এই দুর্য্যোগে দুইজন পথিক নীরবে সামান্য একটা লণ্ঠনের আলোক সাহায্যে ক্ষুদ্র পথদিয়া চলিতেছে। এই দুইজন আর কেহই নহে আমাদের হৃষীকেশ ও সাধু। হৃষীকেশের স্কন্ধে তাঁহার

মৃত পুত্র সীতানাথ। অগ্রে সাধু আলোক সাহায্যে পথ দেখাইয়া চলিতেছে। প্রকৃতির করাল মূর্ত্তিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাঁহারা এইভাবে অগ্রসর হইতেছেন। কত দূর এইভাবে গমন করিয়া দেখেন—সম্মুখে গ্রাম্য শ্মশান। এই স্থানে হৃষীকেশ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণপরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সাধু! সাধু! এইখানে বালকের অন্ত্যেষ্টি করিয়া বাড়ী যাই চল।"

উত্তরে সাধু বলিল—"না বাবাঠাকুর। এখানে সৎকার করা হবে না। চল আরও ক্রোশ দুই চল। রেবতীর মোহনার কাছে চল। তার পর যা বুঝি তাই কর্ব্বো।"

হৃষীকেশ কোন উত্তর করিলেন না; আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অপর স্কন্ধে মৃতপুত্রকে রাখিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। প্রাণ অবসাদে পরিপূর্ণ। হৃদয়ে গুরু ভার লইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। শ্মশান দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। যদিও রমণীসুলভ উচ্চ-কণ্ঠে তিনি চীৎকার করিলেন না বটে, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে অশ্রুজল ছুটিতে লাগিল। আকাশ হইতে অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। পথ জলে জলময়।

পার্শ্বে রেবতী স্ফীত বক্ষে ছুটিতেছে। জগৎটা যেন জল-প্লাবনে ডুবিয়া যাইতেছে। হৃষীকেশের গণ্ডস্থিত অশ্রুজল এই জলরাশির মধ্যে নীরবে মিশিয়া গেল।

উভয়েই এই দুর্য্যোগে ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ দিয়া যাইতে যাইতে বহুপ্রকার বাধা বিঘ্ন পাইলেন। কখন জলমগ্ন ইষ্টকরাশিতে পা ক্ষতবিক্ষত হইতেছে কখন কণ্টক বিঁধিতেছে, কখন পথের পিচ্ছিলতা হেতু পা সরিয়া যাইতেছে ও তদ্ধেতু দেহ হেলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এত কষ্টেও কেহ কোন কথাই বলিতেছেন না। ক্ষণপরে হৃষীকেশ বলিলেন —"সাধু! আমার বাছাকে যে আজ গৃহমধ্যে সর্পাঘাত করিল। কই এই জঙ্গল পরিপূর্ণ পথে একটা সর্পও ত নাই, যে এই অভাগাকে আঘাত করে?"

"ও কি বলছ বাবাঠাকুর! তুমি গেলে আমার মা জননীর এ সংসারে কে থাকবে? আমার আর কে থাকবে? এমন অকল্যাণ কথা কি বলে?"

গম্ভীরভাবে হৃষীকেশ বলিলেন—"না। আর বলবো না।" মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'আমার লাবণ্যের কি হবে? আমি গেলে লাবণ্যের কি হবে? কিন্তু আমার সীতানাথ আজ আমায় ফাঁকি দিয়া চলে গেল। উঃ কি দুর্দ্দৈব! কি দুরদৃষ্ট!

হৃষীকেশকে নীরব দেখিয়া সাধু বলিল—কি ভাবছ বাবাঠাকুর ?

হৃষীকেশ বলিলেন—কি আর ভাববো সাধু।

প্রায় দুইঘণ্টা পরে উভয়ে রেবতী ও দামোদরের সঙ্গম স্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভীমকলেবর দামোদরের আজ প্রতাপ দেখে কে ? কি খরস্রোত—কি গভীর গর্জ্জন উৎফুল্ল প্রাণে দামোদর আজ দুর্দ্দান্ত পরাক্রম বিস্তার করিয়া দুকূল ভাসাইয়া ছুটিতেছে। এই সঙ্গমস্থলে আনিয়া সাধু থামিল। হৃষীকেশ নিজপুত্রকে স্কন্ধ হইতে দামোদর তটে নামাইলেন। পরে সাধুকে বলিলেন—"সাধু! এইবার বালকের শেষকার্য্যের ব্যবস্থা কর। কাষ্ঠাদি আহরণ কর।"

"যে আজ্ঞা। আমি তাই যাই।" এই বলিয়া সাধু নিজ কটি দেশ হইতে একখানি তীক্ষ্ণ 'দা' ও রজ্জু বাহির করিয়া নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ক্ষণেক পরে সাধু দুইটি ছোট কদলীবৃক্ষ আনিয়া মৃতদেহের পার্শ্বে রাখিল। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে সরস কদলীবৃক্ষখণ্ড দেখিয়া হৃষীকেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি সাধু কাট কোথায় ?"

"দাদাঠাকুর কাট খাএ ম'লে কি পোড়াতে আছে ?"

এই বলিয়া দা ও রজ্জুর সাহায্যে সাধুচরণ অনতিবিলম্বে একটি ছোট কদলী বৃক্ষের ভেলা প্রস্তুত করিল। তাহার পর দাএর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ লণ্ঠনের দীপসাহায্যে রক্তিম বর্ণ করিয়া মৃত বালকের পৃষ্ঠদেশে তদ্দ্বারা একটি ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

যখন ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে তখন হৃষীকেশ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"ও কি কর সাধু! আহা হা বাছার গায়ে আর জ্বলন্ত লৌহের দাগ দিও না।"

"বাবাঠাকুর কষ্ট শুধু তোমার হয়—আমার কি কিছু হয় না? আমি কেন এমন করলাম তা জানকি? বাবা মরবার আগে আমাকে অনেকগুলি আদেশ করে যান, তাই আজ সেই আদেশ একটা পালন করলাম। বাবা ঠাকুর! আজ বুক পাষাণে বেঁধেছি। নাও এইবার তোমার কাজ কর।" এই বলিয়া সাধু মৃতদেহকে ভেলার উপর সাজাইয়া দামোদরের বাঁধের প্রান্তভাগে লইয়া যাইতে বলিল।

এখন বৃষ্টি থামিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির বিশেষ ভাবান্তর কিছু ঘটে নাই। দামোদর দুইধারে কূল ভাসাইয়া খরস্রোতে ছুটিতেছে। যেন বাঁধের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না।

দীপালোকে হৃষীকেশ একবার নিজপুত্রের মুখ নিরিক্ষণ করিলেন। বিষে মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও মুখশ্রী যেন বিলীন হয় নাই। এখনও কমনীয় ভাব যেন সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। বার বার হৃষীকেশ নিজ মৃতপুত্রকে দেখিলেন। আবেগ ভরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। ভেলাটিকে আস্তে আস্তে দামোদর জলের উপর রাখিলেন। এখনও তিনি ভেলা ধরিয়া আছেন। কিন্তু বহিস্রোত উহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

"সাধু! সাধু! আর একবার দেখি।"

নীরব নিস্পন্দ সাধু হস্তস্থিত আলোক উত্তোলন করিল। হৃষীকেশ আবার দেখিলেন। আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি বালকের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"বাবা! জনমের মত চল্লে।" অমনি হস্তের মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে খরস্রোতে ভেলা ভাসিয়া গেল।

"সাধু। সাধু ঐ আমার সীতানাথ যাচ্চে। ঐ যায়—ঐ যায়।"

"চলে আসুন বাবাঠাকুর।"

গভীর গর্জ্জনে একটা বৃহৎ তরঙ্গ কূলে আসিয়া আঘাত

করিল। চক্ষু ফিরাইয়া লইবার পূর্ব্বে নিমেষমধ্যে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হৃষীকেশ নিজের দেহ সরাইয়া লইবার পূর্ব্বে স্তূপাকার বালি ও মৃত্তিকা সহ দামোদর-জলে ভীষণ শব্দে পতিত হইল।

"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! কি সর্ব্বনাশ হলো।"

আবার এক ভীষণ তরঙ্গ—কি হইল? পতিত স্তূপ-রাশির কোন চিহ্নই রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জমিদার বাবুর দ্বিতল কক্ষে দুগ্ধফেননিভশয্যায় দেবেন্দ্রনাথ শায়িত। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। দেবেন্দ্র-নাথের এখনও নেশার ঘোর কাটে নাই। পূর্ব্বদিন সারানিশি জাগরণ, তাহার উপর মদিরার প্রভাব কাজেই অবসাদ এখনও ঘুচে নাই। এ পাশ ওপাশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণেক পরে চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। মাথা এখন ভার দেহ অবসন্ন, নিদ্রায় দেহের জড়তা এখনও যায় নাই, মুখে মদিরার গন্ধ। দেবেন্দ্রনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া এক-খানি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। বাবু উঠিয়াছেন কাজেই

খানসামা রামচরণ হুজুরে হাজির দিল। আলবোলায় সটকা লাগাইয়া তামাকুতে আগুন দিয়া নলটি বাবুর হাতে দিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্যানেজার বাবু কোথায় ?"

"আজ্ঞে ম্যানেজার বাবু নীচে এখনও আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

দেবেন্দ্র—আচ্ছা তাঁকে ডাক দাও।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া রামচরণ বিদায় হইল। দেবেন্দ্র-নাথ একমনে বসিয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন। অনতি-বিলম্বে ম্যানেজার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যানে-জার দেবেন্দ্র বাবুর বাপের আমলের লোক। লোকটি বড় খাঁটি। দয়া ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রাণে আছে। বয়সে প্রবীণ তিনি বাবুর কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

বাবু বলিলেন—"কি খবর, আমি যে কথা কাল বলে ছিলাম তার কি হল ?"

"আজ্ঞে বাবু কি বলবো। টাকা তহবিলে আর কিছুই নাই। একবার দয়া ক'রে হিসাব নিকাশ দেখুন। ষ্টেটের আয় এরূপভাবে অপব্যয়িত হলে কতদিন সুশৃঙ্খলে চলতে পারে ?"

অপব্যয়িত কথাটি শুনিয়া বাবু বিরক্ত হইলেন। উত্তরে বলিলেন—"তুমি কি বলতে চাও ?"

ম্যানেজর বাবু নম্রভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে বলব আর কি? গতবৎসর আকাল গিয়াছে। প্রজারা সকলেই চৈত্র কিস্তির আদায় দিতে পারে নাই তার উপর এবার দুর্ভিক্ষ! গ্রামে গিয়া তাদের অবস্থা দেখলে প্রাণ ফেটে যায়। এ অবস্থায় তাহাদেরই বা কি দোষ দিই। তাহার উপর বাবু আপনি যদি অনর্গল জলের মত খরচ করেন তা হলে কি করা যায় বলুন।"

এই কথাগুলি শুনিয়া জমিদার বাবু রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। আলবোলার নল মুখ হইতে পড়িয়া গেল। রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বলিলেন—"আমি আমার বাপের বিষয় উড়াইয়া দিই বা পোড়াইয়া দিই তোমাদের বলবার কি অধিকার আছে? তোমাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিয়ে টাকা খরচ করতে হবে এমন কোন কথা নাই। ওসব অনধিকারচর্চ্চায় তোমাদের কোন আবশ্যক নাই। আমি যা আদেশ করি তাই তোমাদের পালন করতে হবে। আমার হুকুম তামিল করা চাই। যে প্রকারে হোক যদি আমার আদেশ পালন হয়, তবেই মঙ্গল নচেৎ তোমরা সকলে অবসর লও। অত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে জমিদারী রক্ষা হয় না।"

কথাগুলি শুনিয়া ম্যানেজার বাবু বিশেষ লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের পিতার আমলের লোক। দেবেন্দ্রনাথকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ ভাষা তাঁহার মুখে আজ শুনিলেন, আবার দুইদিন পরে হয়ত অধিকতর অপমানসূচক কথা শুনিতে হইবে এখন এই আশঙ্কাই ম্যানেজার বাবুর মনে উদয় হইতে লাগিল। নম্রস্বরে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে আমরা আপনার চাকর যেমন আদেশ করবেন আমরা সেই মত কার্য্য করতে বাধ্য। তবে উপস্থিত প্রজাদের দুরবস্থার কথা ও আপনার তহবিলের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞাপন করা আবশ্যক বিবেচনায় এসমস্ত কথার উল্লেখ করতে সাহসী হয়েছি।"

বাবু তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই। তাই উত্তরে বলিলেন—না তোমাদের দ্বারা আমার কাজ হবে না দেখছি। নূতন লোক—জবরদস্ত লোক বাহাল করতে হবে। অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধদের অবসর দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ম্যানেজার বলিলেন—আপনার আদেশ কি বলুন? কি প্রকারে জমিদারীর কার্য্য চালালে আপনার মনের মত হয় শুনতে পাই কি?"

দেবেন্দ্র। এসমস্ত এতদিনেও যদি শিক্ষা না করে থাক তা হলে আর শিক্ষা করবার আবশ্যক নাই। প্রজারা খাজনা না দিতে পারে, তাদের কাছারী বাড়ীতে ধরে এনে উত্তম মধ্যম প্রহার দিতে হবে, ঠাণ্ডা গারদে পূরতে হবে, ঘর জ্বালিয়ে দিতে হবে। আজকালকার বদমাইস প্রজাদের গায়ে হাত বুলিয়ে কি টাকা আদায় হয়? যাক্ তোমাদের ক্ষমতা বেশ বুঝেছি। তোমরা যাও; শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে ভেক গ্রহণ করগে। তোমাদের দ্বারা কোন কাজই হবে না।

ম্যানেজার। দেখুন আপনি যা ভাল বুঝবেন তা করবেন। তবে কি জানেন আমারও গঙ্গামুখো পা হয়েছে। প্রকৃত কথা আমার আর কাজ ক'রবার বয়স নেই। বাল্যকাল হ'তে এই রায় পরিবারের অন্ন খেয়ে আসছি, মায়া মমতাটা কিছু বেশী। এজন্য এখনও এ বয়সে দাসত্ব করছি। তা বাবু আমি ত অপটু হইছি। আমায় হাসিমুখে বিদায় দিন। আমি অবসর লই। আমার এমন দিন কি হবে যে ৺বৃন্দাবনধামে গিয়ে প্রভুর চরণে মন দিতে পারব? রাধাগোবিন্দজী আপনার মঙ্গল করুন আপনার সুমতি দিন। স্বর্গীয়

পিতৃদেবের পদ অনুসরণ করে পিতৃগৌরব বজায় রাখুন এই আমার কথা।

এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে অভিবাদন পূর্ব্বক ম্যানেজার বাবু দেবেন্দ্রনাথের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বিদায় লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে পর্দ্দার পার্শ্বে নাপিত বউ অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তার পর নাপিত বউকে অন্তরালে ডাকিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক পরামর্শ করিলেন। বলাবাহুল্য পরদিন হরনাথ ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরাতন আমলাদের সকলকেই পুরাতন ম্যানেজারের সহিত বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাহাদের পরিবর্ত্তে দেবেন্দ্রনাথের তোষামুদে চাটুকারের দল সেই পদে বাহাল হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৃষীকেশ তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সাধু নিকটস্থ দুই তিনজন ধীবরকে ডাকিয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তাঁহার ভাসমান দেহ নয়নগোচর হইল। ঐ ধীবরদের সাহায্যে সাধু হৃষীকেশের সংজ্ঞা-শূন্য দেহ বহুকষ্টে তীরে উঠাইল তাহার পর তাঁহাকে নিজ ভবনে আনয়ন করিল। দুই তিন দিন হৃষীকেশের কোন সংজ্ঞা ছিল না। তাহার পর চিকিৎসা ও ঔষধের গুণে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। চিকিৎসক বলিলেন মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগার কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে। হৃষী-কেশ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। "আমার সীতানাথ কোথায় ?" "আমার সীতানাথকে জলে ভাসিয়ে দিলাম" "আমার সীতানাথকে কে কেড়ে নিল ঐ আমার সীতানাথ ভেসে যায়"—এই এখন তাঁহার বুলি। অল্পদিনের মধ্যে হৃষীকেশ ঘোর উন্মাদ হইয়া গেলেন।

লাবণ্যের বিপদের উপর বিপদ। এই বৃহৎ জগতে ঐ এক উন্মাদ স্বামী ছাড়া তাঁহার আপন বলিতে কেহ

রহিল না। স্বামীর চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষার জন্য গৃহে যাহা কিছু ছিল তাহা বিক্রয় হইয়া গেল। জজপত্নী যথা-সাধ্য সাহায্য করিলেন বটে কিন্তু এ বিপদে সে সাহায্য অতি অল্প। দেবর হরনাথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত দেখিয়া লাবণ্য বহুবার তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ক্রমে দৈন্য ও দারিদ্র্য ঘোর বিভীষিকারূপে আসিয়া এই অসহায় বালিকাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। লাবণ্য চক্ষে অন্ধ-কার দেখিতে লাগিলেন। এ বিপদে মধুসূদন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া দুরন্ত সংসারসাগরে নিজেই কর্ণধার সাজিয়া তরণী ভাসাইলেন।

এবৎসর অকাল; জমার জমির কোন ফসল হয় নাই। দুর্ভিক্ষ ঘোর কঙ্কাল মূর্ত্তিতে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বস্থানে দেখা দিয়াছে। লাবণ্যের সংসার একরূপ অচল। দু একজন দাতা ও বদান্য যজমান এবং জজ বাবুর অনুগ্রহে দৈনিক কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও মাসিক চারি টাকা বৃত্তি এখন তাঁহার একমাত্র সম্বল। প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল কণায় যাহা কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লাবণ্যের প্রথম কার্য্য উন্মাদ স্বামীকে গ্রাম হইতে বা যদি কোন দিন স্বামী গ্রামান্তরে

নিজের খেয়াল মত গিয়া পড়িতেন তাহা হইলে তথা হইতে তাহাকে গৃহে আনয়ন করা। তাহার পর তাঁহাকে স্নান করাইয়া নিজে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বামীর খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তাঁহাকে গৃহে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উন্মাদ স্বামী কোন কোন দিন দুই তিন ঘণ্টা ঘরে থাকিতেন আবার কোনদিন "যাই, সীতানাথকে খুঁজে আনি" বলিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার গমনপথে বাধা দিতে গেলে উন্মত্ততা বাড়িয়া যাইত। এমন কি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন এবং এক একদিন প্রহার করিয়া চলিয়া যাইতেন। সাধ্বী নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতেন।

কার পাপে এই সরলা পবিত্রা সতীলক্ষ্মীর এত কষ্ট? একথার উত্তর কে দিবে? ইহা তাঁহার পুরস্কার না তিরস্কার? বিশ্বনিয়ন্তা! তোমার কার্য্যকলাপ, তোমার শক্তি বুঝিবার সাধ্য কার?

লাবণ্যের দুঃখের জন্য জগৎ অপেক্ষা করে না। সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সমান ভাবে অবাধে চলিতেছে। দিন আসে দিন যায়, রাত্রি আসে রাত্রি যায়। সময় কাহারও অপেক্ষা

করে না। দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসরের উপর কাটিয়া গেল।

একমাত্র উন্মাদ স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবসর পাইলেই স্বামীর পুঁথি-গুলি রৌদ্রে দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন, স্বামীর কাপড়, গামছা, পাদুকা ও তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পরিপাটি করিয়া গৃহে সাজাইয়া রাখিতেন যেন স্বামী আসিয়া সমস্ত ব্যবহার করিবেন। যখন ঘোর ঔদাস্য আসিয়া তাঁহার রমণীহৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিত তখন তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়া দেবতার উদ্দেশে নিজ স্বামীর কল্যাণে ইষ্টদেবের পূজা করিতেন ও অজস্র-ধারে দেবতা সমীপে অশ্রুজল ফেলিতেন। সেই নেত্রবারি মুছাইবার তাঁহার এজগতে কেহ ছিল না। একে পুত্রহীনা অভাগিনী তাহার উপর উন্মাদ স্বামী। পুত্রশোকসন্তপ্ত-প্রাণে শান্তি আসিবার পূর্ব্বে স্বামী লইয়া এই বিপদ। ইহাতে কাহার ধৈর্য্য থাকে? চক্ষের জল যে লাবণ্যের সঙ্গের সাথি হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এক এক দিন পাগল স্বামী কোথায় কোন গ্রামে গিয়া পড়িত তাহার কোন স্থিরতা থাকিত না। হয়ত দুই তিনদিন পাগল ফিরিল না। স্বামিগতপ্রাণা সাধ্বী স্বামীকে না

খাওয়াইয়া একগণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। অগত্যা দুই তিনদিন তাঁহাকে নিরম্বু উপবাসী থাকিতে হইত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈকালে জজ বাবুদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে গা ধুইয়া এক কলসী জল কক্ষে লইয়া লাবণ্য নিজভবনে আসিতেছেন। পথে নাপিতবৌএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। নাপিতবৌ লাবণ্যের সঙ্গ লইল।

"কি গো বৌঠাকরুণ—কেমন আছ? অনেক দিন খবর নিতে পারিনি দিদি! রোজ মনে করি আসবো তা আর সময় হয় না। দাদাঠাকুরের অসুখটা একটু সেরেছে কি?"

"আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে নাপিত বৌ, যে তিনি আরোগ্য হবেন?"

"তাইত বৌ বড় দুঃখের কথা। তাইত তোমার ভারী কষ্ট।"

"ভগবান মুখ তুলে না চাইলে আমার মত হতভাগীর

দুঃখ কে ঘুচাবে বল? সমস্তই আমার কর্ম্মফল। তা না হলে অমন সোণারচাঁদ ছেলেই বা মরবে কেন? আমার অমন স্বামীইবা এমন হবেন কেন?"

এই স্থানটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী যাইবার ও জজ বাবুদের পুষ্করিণী যাইবার সন্ধিস্থল। এইখানে নাপিত বৌ দাঁড়াইল।

নাপিত-বৌ বলিল—একটু দাঁড়াও বোন! দুএকটা তোমার সংসারের খবর নিই। আহা দাদাঠাকুর আমাকে কি যত্ন, কি দয়াই করতেন। আহা সীতানাথ ত ছেলে নয় যেন রাজপুত্তুর।" এই বলিয়া নাপিত-বৌ চক্ষে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। লাবণ্যের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নাপিত-বৌএর এইরূপ সহানুভূতি দেখিয়া লাবণ্য অগত্যা দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। যদিও তিনি বুঝিলেন যে এ স্থানটি জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ্য স্থান তথাপি লাবণ্য একটু দাঁড়াইলেন। তাহার ক্ষণেকপরে নাপিত-বৌ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"বৌঠাকরুণ! তোমার ত ভারী কষ্ট। আহা রূপ নয়ত যেন প্রতিমা। এত রূপ দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।"

"কিসের জন্য রূপ—কিসের জন্য দেহ নাপিত-বৌ?

তোমরা পাঁচজনে এই কামনা কর যেন এই হাতের নোয়া নিয়ে আমার পাগল স্বামীর আপদ বালাই নিয়ে মরি। আর বেঁচে কাজ নেই। বড় জ্বালা নাপিত বৌ এ সংসারে বড় জ্বালা।"

নাপিত বৌ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"বৌ ঠাকরুণ! সত্য বলছি তোমার কি রূপ? এই সতের তালি জির্‌জিরে কস্তাপাড় কাপড় পরে রয়েছ তবু যেন রূপ ফেটে পড়ছে। আহা খাওয়া দাওয়া পরবার তোমার এত কষ্ট! তুমি যে রাজার রাণী হবার যুগ্যি গো। তোমার এত দুঃখ—এত কষ্ট।"

কথাগুলি শুনিয়া লাবণ্য একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন; পরে উত্তর করিলেন—

"কি বলছ নাপিত বৌ? আমার এক কষ্ট এই যে আমার স্বামী পাগল। মধুসূদন তাঁর মাথা ভাল করে দিন আমি সারা জীবন ছেঁড়া কেঁথা পরে থাকবো। আমার স্বামী ভাল হলে আমার কিসের দুঃখ নাপিত বৌ? খাবার পরবার দুঃখ ত এক দিনও আমার মনে হয় না। স্বামী পাগল তবু তাঁকে কাছে পেলে মনে হয় আমি রাজার রাণী—আমার চেয়ে ঐশ্বর্য্যশালিনী কে আছে?

ভিক্ষা ক'রে ছুটি ভাত রেঁধে তাঁকে খাওয়াতে যাই, তাতে কি সুখ—তাঁতে কি আনন্দ তা তোমায় কি ক'রে বোঝাব ? কিন্তু ভগবান সে সুখেও আমায় মধ্যে মধ্যে বঞ্চিত করেন। আজ ছুদিন তাঁর কোন সন্ধান পাইনি। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা জানি না। তুমি বলতে পার ? তুমি ত অনেক যায়গায় যাও তাঁকে দেখেছ কি ?

নাপিতবৌ।—না বোন্ আমি ত দেখতে পাইনি। পাগলের খেয়ালে কোথায় গিয়ে পড়েছে। আবার আসবে—তার জন্য ভাবনা কি ? তুমি গিয়ে খাওয়া দাওয়া ক'রে ঘরে ব'সে থাক। নিজে না খেতে পেয়ে ক'দিন বাইরে ঘুরবে ? আপনিই আসবে ? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—পাগল ছাগল সবাইয়েরি সমান।"

লাবণ্য কোন উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ বদলাইয়া বলিল—"এখন যাই। পথের ধারে দাঁড়িয়ে এ রকম কথাবার্ত্তা কহিলে পাঁচ জন দেখে নিন্দে কর্ব্বে।" এই বলিয়া লাবণ্যময়ী নিজ গৃহাভিমুখে পদসঞ্চালন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নাপিত বৌ নাছোড়বান্দা। অমনি বলিয়া উঠিল—"হাঁ! ভাল কথা মনে পড়ে গেছে। কথাটা বলতে একেবারে ভুলে যাচ্ছিলুম। সে দিন জমিদার বাবু দাদা ঠাকুরের ও তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা

বলছিলেন ও অনেক দুঃখ করছিলেন।" লাবণ্য জমিদার বাবুর নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জমিদার বাবুর কীর্ত্তি-কলাপের বিষয় অনেকটা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন —"কে ?"

নাপিতবৌ।—"আমাদের গাঁয়ের জমিদার দেবেন্দ্রবাবু গো। তিনি বলছিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৌএর ভারী কষ্ট—তাদের কষ্টের কথা শুন্‌লে বুক ফেটে যায়। তিনি তোমার দুঃখ কষ্ট দেখে সত্য সত্যই বড় কাতর হয়েছেন। আর এই দুঃখের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর দয়ার শরীর বৌ ঠাক্‌রুণ দয়ার শরীর। সে দিন আমায় বলছিলেন তোমার কি কি অভাব, কি চাই যদি আমার মুখ দিয়ে তাঁকে বলে পাঠাও তাহলে তিনি এখনি পাঠিয়ে দেন। তাঁকে গিয়ে কি বলবো ? দেখ অত বড়লোক—আপনি উপযাচক হয়ে যখন তোমার দুঃখে সাহায্য করতে চাচ্চেন তখন আর তোমার ভাবনা কি ? যা মনে করবে তাই পাবে।

কথাগুলি শুনিয়া লাবণ্য রোষে ক্ষোভে কাঁপিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার এই অসহায় অবস্থায় জমিদারের অপ্রিয় কোন কথা বলিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হওয়া

অপেক্ষা মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া বলিলেন ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। তাঁকে ব'লো যে তাঁর এই সৎ প্রবৃত্তির কথা শুনে আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি—তিনি যেন সুখে থাকেন। আমার কোন কষ্ট বা অভাব নেই। আমার স্বামী প্রকৃতিস্থ হউন এই কামনা যেন তিনি করেন অর্থের আমার আবশ্যকতা নেই।" এই বলিয়া নিজের গন্তব্য পথের দিকে ফিরিলেন। ফিরিবার মুখে দেখেন অদূরে বৃক্ষান্তরালে কে যেন একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লজ্জায় অধোবদন হইয়া লাবণ্য শুধু বলিলেন—

"ও কে? গোপনে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছে, ও লোকটা কে?" এই বলিয়া একবার নাপিত বৌএর সর্ব্বাঙ্গে খর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তেজস্বিনী অভিমানিনী নিজ গৃহ মুখে বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

চকিৎ-চপলা ঝলসে দিশাহারা পথিকের ন্যায় নাপিত-বৌ ক্ষণেক মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঠক বুঝিয়াছেন ঐ আগন্তুক কে? নাপিত বৌএর মুখে লাবণ্যর অতুল সৌন্দর্য্যের কথা ও তাহার উপস্থিত আর্থিক দুরবস্থার কথা দেবেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাকে অধিকার করিয়া সেই অতুলনীয় রূপ ভোগ করিবার জন্য নীচ প্রবৃত্তি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরূক হয়। এবং উপস্থিত দুরবস্থাই তাঁহার এই পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে একটা মহৎ সুযোগ বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। এই বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে এই নিরুপমা সুন্দরীর একবার দর্শনলাভ-আশায় দেবেন্দ্রনাথ নাপিত বৌএর শরণাপন্ন হন। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ ও যুক্তি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সাধারণ পথের পার্শ্বে এক বাগানের বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যে কৌশলে লাবণ্যর দর্শন লাভ করিলেন, তাহা গত পরিচ্ছেদে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। লাবণ্যর রূপ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ উন্মাদ হইয়া উঠিলেন সেই জন্য আজ দর্শনের পরই নাপিত-বৌকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার দ্বিতল কক্ষে বসিয়া কিরূপে লাবণ্যকে লাভ করা যায়, কিরূপে তাঁহাকে তাঁহার

বিলাসের দাসী করিতে পারা যায়; সেই বিষয়ে গভীর আলোচনা হইতে লাগিল।

"নাপিত বৌ! আজ কি দেখলাম। এত রূপ, অমন যৌবন—হায় হায় মাঠে মারা যাচ্ছে। আমি ত আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না।"

"দেখুন অত উতলা হলে কি চলে? একটু সয়ে সবুরে সব কাজ করতে হবে। মাগীর ভারি তেজ গো বাবু।

"কিন্তু তুমি খুব কৌশল ক'রে আজ দেখিয়ে দিয়েছ। ছুঁড়িটা শেষে কিন্তু দেখে ফেলেছে।"

"সেই জন্যই ত একটু ভাবনা হয়েছে। আমার বোধ হয় আমাকে একটু সন্দেহ করেছে।"

"কেন? কি করে বুঝলে? তোমায় কিছু ব'লছে না কি?"

"না তা বলেনি বটে, কিন্তু আপনাকে দেখেই ছুঁড়ি চেঁচিয়ে উঠলো—ও লোকটা কে? সন্ধ্যার মুখে আপনাকে ভাল দেখতে পায়নি।"

"ভালই হয়েছে।"

"কিন্তু ঐ কথা বলে যেরকম একটা চাহনি মারলে সত্যাই বলছি বাবু আমার ভয় হলো। তাইতেই মনে হচ্চে একটু সন্দেহ করেছে।"

"তা যাই হোক-গে লাবণ্যকে আমার চাই। ঐ পাগল-টার কি সৌভাগ্য! নাপিত-বউ আমার পাগল হ'তে ইচ্ছা করছে।"

"পাগল হ'তে হবে না। রূপচাঁদের লোভ বড় লোভ। একটু বেশ ক'রে রূপচাঁদ ঝাড়লেই সব ঠিক হবে।"

"কত টাকা চাই? সে যা চাইবে তাই দেব। তাকে জানিয়ে দাও যে এই বাক্সভরা গহনা যত আছে সমস্তই তাকে দেব।" এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটা ড্রয়ার খুলিয়া ছোট টিনের বাক্স হইতে প্রায় কুড়িহাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার বাহির করিয়া দেখাইলেন।

নাপিত-বউ এ সমস্ত গহনাগুলি দেখিয়া বলিল—"তাত বুঝলাম। কিন্তু প্রথমে রাজী করাই বড় শক্ত। ছুঁড়িটা ঐ পাগলার প্রেমে মরা গো বাবু।"

বিরক্তি সহকারে দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"না, না তা হবে না। আমার প্রেমে তাকে মরতে হবে। তুমি যা চাও তাই দেব। তোমায় কুড়ি বিঘা জমি ও একহাজার টাকা নগদ দেব। তিনপুরুষ তোমাদের আর দুঃখ ক'রে খেতে হবে না। যেমন ক'রে হ'ক লাবণ্যকে চাই। নাপিত-বউ! নাপিত-বউ! আমার আর ধৈর্য্য সয় না।"

"দেখুন বাবু অত উতলা হ'লে সব ফস্কে যাবে। দাঁড়ান দেখি, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। জজবাবুর গিন্নী তাকে বড় যত্ন করে—সদাসর্ব্বদা চোকের উপর রাখে। তার উপর ঐ যে একটা যমদূত আগলে আছে—সে বেটাকে আমার বড় ভয়।"

"সে আবার কে?"

"ঐ যে সাধু বেটা। বেটা আবার সাধু। আগে ডাকাতি কর্ত্তো তার পর জজ বাবুর জমি নিয়ে বেটা সাধু হয়েছে। জজবাবু পেছনে না থাকলে এতদিন বেটাকে শ্রীঘরে যেতে হতো। সেদিন আমি পথদিয়ে যাচ্ছি অমনি বেটা আমায় দেখে বল্লে কি জান—বল্লে "কিগো নাপিত বউ কার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ঘুরচো?" কি বলবো রাগে আমার গাটা গস্ গস্ করতে লাগলো। মনে হ'লো হাতে ঝাঁটাগাছটা থাকলে বেটার মুখে সপাসপ্ মেরে বিষ ছেড়ে দিতুম। কিন্তু যে দুস্‌মন চেহারা। আমি কোন কথা বলতে সাহস করলাম না। মনে মনে বল্লুম বেটা দিন পাই ত তোমার শ্রাদ্ধ আমি করব।"

"তা হলে কিরকম ভাবে চলা যায় বল দেখি?"

"দেখুন ঐ যমদূত বেটাকে হঠাতে হবে আর ঐ পাগলাটাকে পথ থেকে সরাতে হবে। ঐ দুবেটাকে

চোকের আড়াল করলে মাগী একরকম না খেতে পেয়ে মর মর হবে। সেই সময় আমিও চাল চালবো।"

"বেশ মতলব করেছ। দাঁড়াও বাকীখাজানাত পড়েছে। কালই হরনাথকে বলে তাদের পাঁচ বিঘা যে জমার জমি আছে তাই বাকীখাজানার দায়ে নিলাম ক্রোক করিয়ে ছুঁড়িটাকে উদ্বাস্তু কল্লে কতক্ষণ স্থির থাকবে ?"

"মতলবটা মন্দ করেন নি।"

এইরূপে নিঃসহায়া নিরীহ বালিকাকে নির্যাতন করিবার জন্য যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তাহার জল্পনা হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে ম্যানেজার হরনাথকে এই পরামর্শে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। লোকপরম্পরায় শুনা যায় যে সেই রাত্রে প্রায় একটা অবধি সকলে মিলিত হইয়া গভীর গবেষণার পর তবে সভা ভঙ্গ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ তিন দিন পাগলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লাবণ্যর তিন দিন অনাহার। শুধু অজস্রধারে কাঁদিতেছেন আর কায়মন বাক্যে উন্মাদ স্বামীর মঙ্গল

কামনার্থে ভগবানকে ডাকিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে দু'এক বার এইরূপ ঘটনা যে ঘটে নাই এমন নহে কিন্তু সে সময় লাবণ্য ও সাধু উভয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে দামোদর তটে যেখানে সীতানাথকে ভাসাইয়া দিয়াছিল সেই থানে তটে বসিয়া কাঁদিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু গত রাত্রে নাপিত-বৌএর কথার পরও একজন অপরিচিত পুরুষের বৃক্ষান্তরাল হইতে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করার পর হইতে লাবণ্য একটু আতঙ্কিত হইয়াছেন। এই কারণে নিজ-বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করিলেন না। সাধু উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করিয়াছে এ অবস্থায় তাহার দ্বারা কোন উপকার সম্ভবে না। অগত্যা লাবণ্যর একাকিনী নির্জ্জনে রোদন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

লাবণ্যকে শান্ত করিবার জন্য জজ-পত্নী সাবিত্রী দেবী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছেন। লাবণ্যকে তিনি পল্লী সুবাদে বৌমা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি আসিয়াই লাবণ্যর অশ্রুশিক্ত লোচন ও শীর্ণ শুষ্ক এবং মলিন দেহ দেখিয়া নিজে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরে বলিলেন—

"বৌমা! এরকম করে উপবাস ক'রে থাকলে ক'দিন

বাঁচবে ? আর এ রকম করে কি থাকতে আছে ? এতে যে হৃষীর অকল্যাণ করা হয় মা ।"

"মা তুমি ভয় পেওনা । এ অভাগীর কি মৃত্যু আছে ? জলতে পুড়তে এসেছি, জ্বলে পুড়ে মরতে হবে মা ! এত শীঘ্র কি তোমার এমেয়ে মরবে ?"

"ছি ! ছি ! অমন কথা ব'লো না । কর্ত্তা তোমার দুঃখের কথা শুনে চাকরদের চারিদিকে পাঠিয়েছেন ও নিজেও হৃষীর সন্ধানে বেরিয়েছেন । আমার বোধ হয় শীঘ্রই তাকে খুঁজে নিয়ে আসবেন । তুমি উঠ ।—মুখ হাত ধোও । রান্নাবান্নার যোগাড় কর ।"

"না মা ! আমার হাত পা উঠছে না । আমার কিছু ভাল লাগছে না । মা এমন পোড়া কপাল নিয়ে জন্মে ছিলাম । এ সংসারে এক পাগল স্বামী ভিন্ন আপনার বলতে কেউ নেই । তা মা তাঁকে নিয়েও মনের শান্তিতে থাকতে পেলুম না । যখন তিনদিন তাঁর দেখা নেই তখন মনে হয় বুঝি তাঁর একটা বিপদ হয়েছে । মা শেষে কি আমার সীঁতের সিদূরটা অবধি মুছে যাবে ? শেষে কি ভগবান এই একগাছা কামারের নোয়া গাছটাও কেড়ে নেবেন ? মা ! মা ! আমি আর স্থির থাকতে পারছি না ।"

লাবণ্য আর ভাবিতে পারিলেন না । তিনদিন অনাহার

তার উপর দুশ্চিন্তায় ও মনের অশান্তিতে তিনি একেবারে অধীর হইয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল—গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তিনি ভূমিতলে শুইয়া পড়িলেন।

জজ-পত্নী তৎক্ষণাৎ নিজের দাসীকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া লাবণ্যার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে জজ বাবু পাগল হৃষীকেশকে বহু অনুসন্ধানের পর ধরিয়া আনিলেন। জজ বাবু আসিয়া লাবণ্যর দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি ভূলুণ্ঠিতা লাবণ্যর নিকট আসিয়া বলিলেন—

"মা! মা! চেয়ে দেখ, ওঠ। তোমার স্বামীকে খুঁজে এনেছি।" লাবণ্য নেত্র উন্মিলন করিয়া দেখেন সম্মুখে তাঁহার পাগল স্বামী দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি একমনে চাহিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া লাবণ্যর নয়ন প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ যেন কোন মন্ত্রশক্তি বলে উঠিয়া বসিতে গেলেন। সাবিত্রী তখনও উঠিতে দিলেন না। লাবণ্য অবগুণ্ঠনবতী হইয়া জজ বাবুর কথার উত্তর দিলেন—

"বাবা! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।"

হৃষীকেশ নীরবে একমনে স্থির দৃষ্টিতে এই সব দেখি-লেন। পরে সাবিত্রী দেবী হৃষীকেশকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—"এই তিনদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে কোথা ছিলে বাবা? এখানে বৌমার কি দশা হয়েছে দেখছো কি?"

"কি দেখবো মা! এই যে লাবণ্য শুয়ে প্রায় মড়ার মত হ'য়ে গেছে। বা! বা! বেশ সংসার চলছে। অবাধে চলছে। লাবণ্যও আজ মরতে বসেছে। লাবণ্যকে ও সাপে খেয়েছে বুঝি? বেশ, বেশ। কই, সাধু কোথা? সাধুকে ডাকি ভেলা তৈরি করতে হবে। এবারে বড় ভেলা চাই। আবার দামোদরে ভাসাতে হবে। সীতা-নাথ যে পথে গেছে, লাবণ্যকেও সেই পথে ছেড়ে দিতে হবে। মা! মা! আমি কবে যাবো?"

সাবিত্রী—ওকি কথা বাছা? অকল্যাণ কথা বলো না বাবা! বৌমা অনাহারে তোমার জন্য ভেবে মূর্চ্ছিত হয়েছেন। বাবা কাছে এস বসে দুএকটা কথা কও। অমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি হয় বাবা?

হৃষী—না মা। আর ঘুরবো না। আমি সীতানাথকে খুঁজতে গিছলুম। খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর গিয়ে পড়ে-ছিলুম।

সাবিত্রী—বাবা! তুমি ঘরে থাক! ঘরকন্না দেখ। তোমরা বেঁচে বত্তে থাক আবার খোকা হবে। ওরকম ঘুরে ঘুরে কি বেড়ায়? চল স্নান কর। বৌমাকে বোঝাও, খাওয়া দাওয়া কর।

লাবণ্য ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। সাবিত্রী এই সময় পাকশালায় গিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সাধুও জজ বাবুর সহিত হৃষীকেশের সন্ধানে গিয়াছিল। এখন সেও আসিয়া হৃষীকেশের নিকট বসিল। তারপর সাধু বলিল—চল বাবাঠাকুর স্নান করে আসি।

হৃষীকেশ কোন উত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ক্ষণেক আপন মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তখন লাবণ্য সাধুকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—"সাধু তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ দিতে পারবো না। তুমি এই অনাথিনীর জন্য যে কষ্ট ভোগ করছ তা বলে প্রকাশ করা যায় না।"

"মা! আমি তোমার ছেলে। মায়ের কষ্ট কি ছেলে দেখতে পারে মা? মা আমি বড় কাঙ্গাল। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি। একটু গতরে খেটে দিই এ আর বেশী কথা কিমা?"

"না বাবা। তোমার মত উঁচু প্রাণ যদি জগতে থাকে তাহ'লে জগতের অর্দ্ধেক দুঃখ দূর হয়। আচ্ছা এখন তোমার বাবাঠাকুরকে স্নান করিয়ে আন। আমার বোধ হয় এই তিনদিন কিছু খান নাই।"

"আমারও তাই বোধ হয় মা।" এই বলিয়া হৃষীকেশের উদ্দেশে সাধু চরণ বলিল—

বাবাঠাকুর চল নেয়ে আসি। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। এ কদিন খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি? চল নাইতে যাই।

"চল চল সাধু চল—ঘাটে যাই চল। কোন ঘাটে নাইবে?"

"জজ বাবুদের পুকুরে।"

"না না চল সেই দামোদরের ঘাটে যাই। সেই খানে আমার সীতানাথ ভেসেছে চল সেই খানে যাই।"

"বাবাঠাকুর তুমি অমন ধারা ক'রো না। যে যাবার সে চলে গেছে তার জন্য আর ভেবে কি হবে?"

"কে গেছে! সীতানাথ? না—না—আমার সীতানাথ কোথা যাবে? সে আমায় ছেড়ে কোথা যাবে? সে আমারই আছে। সীতানাথ ভেলায় চড়ে সাগরে রাজ্য করছে। সাধু! সাধু! আমি দিব্য দেখতে পাচ্ছি ঐ

আমার সীতানাথ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ঐ আমায় ডাকছে—ঐ আমায় বাবা ব'লে ডাকছে।"

এই প্রলাপ বচন শুনিয়া সাধুর চক্ষে জল আসিল। লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় বাইজী কৃষ্ণপ্রিয়ার ভবনে দেবেন্দ্রনাথের ম্যানেজার হরনাথ ভট্টাচার্য্য, বাইজী ও বাইজীর মাতা মঙ্গলা দাসী একত্রে বসিয়া জল্পনা করিতেছে। মঙ্গলা দাসী বলিতেছে—

তা বাবা, তুমি যা বলছ, তাতে আর আমাদের অমত কি?

হরনাথ উৎকণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল—আমি সে ঠিক কর্ব্বো, কিন্তু অর্দ্ধেক বখরা আমার চাই।

বাইজী—দেখ হরনাথ বাবু, যদি এক দমে কুড়ি পঁচিশ হাজার বার করা যায়—তাহ'লে তুমি কিছু নিলে আমার লোকসান কি আছে?

হর—না ভাই, কিছু বল্লে চলবে না। যা পাইয়ে দেব, তার অর্দ্ধেক চাই।

তখন বাইজী একটু মুচকিয়া হাসিয়া হরনাথের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া তাহার দাড়ী ধরিয়া একটু সোহাগভরে বলিল —তাই হবে গো তাই হবে। আচ্ছা, তুমি কি বলছিলে বাবুর অবস্থা বড় খারাপ। ভিতরের ব্যাপারটা কি?

"ব্যাপারটা কি জান—কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কতক্ষণ আর থাকে বল।"

মঙ্গলা দাসী কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাই বলিয়া উঠিল—বল কি:বাবা? অত বড় :জমিদার—এই দুই বৎসরের মধ্যে কাপ্তেন ফেল। না, না, আর দেরী করা হবে না। ওলো কৃষ্ণপ্রিয়া! বাবা যে মতলব করেছেন, যত শীঘ্র পার সেই কাজটি কর। তোমার ও বাবু বেশী দিন নয়।

কৃষ্ণপ্রিয়ার কথার উপর কথা কহিল দেখিয়া কৃষ্ণ-প্রিয়া ঈষৎ কুপিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—তুই মাগী ভ্যান-ভ্যান করিস্ না। আমি জানি যা করতে হবে। তুই মাগী চুপ কর।

মঙ্গলা দাসী আশু অমঙ্গল সম্ভাবনায় নীরব হইয়া রহিল। বাইজী হরনাথের আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া

গায়ে ঠেস দিয়া বসিল। পাণদান হইতে পাণ লইয়া হরনাথের হাতে পাণ দিল। নিজে দুইটি পাণ মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রৌপ্য ডিবা হইতে সুরতী বাহির করিয়া খাইল ও চাকরকে রূপার আলবোলায় তামাকু দিবার আদেশ করিয়া হরনাথকে বলিল—

তার পর ঠাকুরপো, কি বলছিলে বল।

হরনাথ আস্তে আস্তে একটি তাকিয়া টান দিয়া তদুপরি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া বাইজীর সুললিত সুকোমল করে কর স্থাপন পূর্ব্বক বলিল—

বাবুর বহুপ্রকার ব্যয়ে টাকার টানাটানি পড়ে। কাজেই উপায়ান্তর না দেখে পঞ্চাশ হাজার টাকায় কৃষ্ণপুরের জমিদারী বসতবাটী প্রভৃতি সমস্তই আমাদের ওখানকার জজবাবুর কাছে বন্দক দিয়ে টাকা ধার নিয়েছেন। হাতে এখনও বিশ পচিশ হাজার টাকা আছে।

বাইজী—বাকিটা কি হলো? কতদিন বন্দক দিয়েছেন?

হর—আজ মাস তিন চার।

"এর মধ্যে কিসে এত খরচ হলো? আমায় এমন ত কিছু বেশী দেন নি?"

"বাইজী! তোমায় দিলে আমার দুঃখ কি? তাহ'লে সে টাকা ত আমাদের ঘরেই থাকতো।"

এই কথা শুনিয়া মঙ্গলা দাসী আর নীরবে থাকিতে পারিল না। তাই আবেগভরে বলিয়া উঠিল—

"আহা বাবা! ভদ্দরনোকের ছেলে কি না—কথাগুলো কি সুন্দর দেখেছো। বাবা তোমার যেমন মন, তাতে তুমি শীগ্গির দেশের রাজা হবে। আহা বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক!

বাইজী এই কথার কোনরূপ সমর্থন না করিয়া একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কিসে অত টাকা খরচ হলো?

হর—কি বলবো বাইজী! আমাদের পাড়ায় একটা নাপিত-বৌ বলে লোক আছে। সেই বেটি প্রায় দিন-রাত ভজং-ভাজং দিয়ে অনেক টাকা বার ক'রে নিয়েছে।

মঙ্গলা—সেই বেটি কুটনি বুঝি? বাবা, বেটিকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিতে পার না? বাবুর সর্ব্বনাশ করছে মাগী। তোমরা দশজনে বাবুকে বুঝিয়ে মাগীকে দেশছাড়া করতে পার না?

হর—বাবুর পীরিতের লোক তাকে কি করে কি বল?

বাইজী একটু উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সেই মাগী বুঝি বাবুর বড় প্রিয় ?

"হাঁ, আমাদের গাঁয়ের অনেকের অন্দরে সে যায় আর ভাল ভাল সুন্দরী মেয়েদের যোগাড় করে এনে দেয় এই হ'লো তার কাজ। আর আমাদের বাবুর যার উপর ঝোঁক পড়বে তাকে চাই ; যত টাকা লাগে তাকে হস্তগত করতেই হবে। কাজেই মাগীর'ও মুরসুর দু'হাতে টাকা লুটছে।"

বাই—ঠিক বলেছ ঠাকুরপো—ঠিক বলেচ। আমি ঐরকমের একটা গুজব শুনেছিলুম বটে। হাঁ গা তোমাদের দেশে একজন পাগল ব্রাহ্মণ কে আছে, তার বউ নাকি খুব সুন্দরী ? বাবুর নাকি তার উপর খুব ঝোঁক পড়েছে ? আর বাবু নাকি বলেছেন যে সেই ছুঁড়িটাকে যোগাড় করতে পারলে একহাজার টাকা বক্‌সিস দেবেন ?

বাইজী এই কথাগুলি বলিয়া বক্রদৃষ্টিতে হরনাথের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। পাগল ও তাহার স্ত্রীর কথা শুনিয়া হরনাথ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া কি উত্তর দিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না—থতমত খাইয়া বলিল—পাগল ব্রাহ্মণ ? তাই ত—তাই ত আমিত ভাল ঠিক করতে পারছি না। আমিত সেরকম কিছু

শুনিনি। ঐ নাপিত বৌটা কি করছে সেই জানে জানে—আমি অত খবর কি জানি? যাক্‌গে মরুক্‌গে—হ্যা আমি যা বললাম সেই কথা যেন স্মরণ থাকে। আমি আজ উটি। এই বেলা শীঘ্র শীঘ্রই কাজ হাসিল না করলে পরে আর কিছু পাবে না।

মঙ্গলাদাসী চক্ষু ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল —সে কি কথা বাবা? তুমি যেমন বল্লে সেই মত কাজ আজই হ'ক, না হয় কালই হ'ক করতেই হবে। ও বাবুর ভরসা কি?"

তখন হরনাথ উঠিবার উদ্যোগ করিল। বাইজীর মাতাঠাকুরাণী অবসর বুঝিয়া গৃহত্যাগ করিল। তখন বাইজী হরনাথের হাত ধরিয়া ছল ছল ভাবে বলিল—তাইত ঠাকুরপো, যাবে? এখনি যাবে? তোমায় ছেড়ে দিতে আমার মন সরে না। সত্যি কথা বল্‌তে কি—তোমায় নিয়ে গৃহত্যাগী হই তাতেও আমার সুখ আছে। কি চোকে যে তোমায় দেখেছি ঠাকুর পো—এই বলিয়া বাইজী কৃষ্ণপ্রিয়া একটি জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। হরনাথ মনে মনে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। একটু পরেই উত্তর করিল—"বাইজী! বাইজী! আমায় আকাশে তুলে শেষে যেন মাটিতে আছাড় মেরো না।"

"বেইমান!" এই বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া হরনাথকে বাহু পাশে আঁবদ্ধ করিয়া তাহার গালে দৃঢ় চুম্বন করিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধুচরণ হৃষীকেশকে স্নান করাইয়া আনিল। জজ-পত্নী উপস্থিত থাকিয়া নিজে পরিবেশন করিয়া হৃষীকেশকে আহার করাইলেন। হৃষীকেশকে সহসা কেহ দেখিলে পাগল বলিতে পারিত না। যতক্ষণ হৃষীকেশ আহার করিলেন ততক্ষণ বেশ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আহারান্তে সাধুচরণ লাবণ্যকে না খাওয়াইয়া গৃহত্যাগ করিবে না বলিল। তখন বেলা প্রায় ২টা। জজ-গিন্নী আজ যেন হৃষীকেশের জননীরূপ ধরিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে আহার করাইতেছেন। হৃষীকেশের আহার শেষ হইলে হৃষীকেশ নিজেই প্রকৃতিস্থ থাকিলে যেরূপ নিজকুটিরে বিশ্রাম করিতে যাইতেন আজও সেইরূপ নিজেই প্রবেশ করিলেন। লাবণ্যও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকি-লেন। স্বামীর এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া লাবণ্যের প্রাণে

যুগপৎ একটু আনন্দ ও আশা জাগিয়া উঠিল। জজগিন্নী লাবণ্যের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া ডাকিলেন—বউমা! এস গো বেলা হয়েছে। দুটি খেয়ে যাও মা।

এই ডাক শুনিয়া হৃষীকেশ স্ত্রীকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—যাও যাও লাবণ্য খেয়ে এস। অনেক বেলা হ'য়েছে; তুমি নাকি তিন দিন জলস্পর্শ কর নি?

স্বামীর সোহাগপূর্ণ এই বচনগুলি শুনিয়া লাবণ্যের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। লাবণ্যের চক্ষু ছল ছল ভাব ধারণ করিল। লাবণ্য মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—দয়াময়! এই শুষ্ক মরুময় প্রাণে কি আবার কুসুম সৌরভ ছুটবে? প্রভু! কতক্ষণের জন্য এই সুখ শান্তিটুকু দিতেছ? সম্মুখে প্রত্যক্ষ যাহা দেখছি উহা বারি না মরীচিকা?

লাবণ্য নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হৃষীকেশ বলিলেন—"যাও, লাবণ্য যাও" লাবণ্য তখনও হাতে তাম্বুল ও জলের গেলাস লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"বৌমা এস গো" বলিয়া আবার জজ-গিন্নী ডাকিলেন।

তখন হৃষীকেশ পূর্ব্বেকার অভ্যাস মত লাবণ্যের হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পান করিলেন ও তাম্বুল

হস্তে লইয়া বলিলেন—আমি এই বিছানায় শুই। তুমি খেয়ে এস।

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি। বল আমি না এলে তুমি কোথাও যাবে না।"

"না না যথার্থই বলছি যাবো না ?"

"তবে আমি আসি।" এই বলিয়া লাবণ্য চলিয়া গেলেন।

সাধু এখনও খায় নাই। লাবণ্য গৃহের বাহিরে গিয়া দেখে সাধু এখনও অপেক্ষা করিতেছে।

লাবণ্য সাধুকে বলিল—সাধু এত দেরী হয়েছে, তুমি এইখানে একখানা পাতা নিয়ে বস।

সাধু—মা তোমাদের পেসাদ পাবো, এত আমার সৌভাগ্য। আগে মা জননীর আহার হ'ক তবে ত ছেলে পেসাদ পাবে।

জজ-গিন্নী লাবণ্যকে আহার করাইয়া সাধুকে আহার করাইলেন।

লাবণ্য অতি অল্পসময়ের মধ্যে আহার শেষ করিয়া লইলেন। কারণ তাঁহার প্রাণে সততই এই ভয় পাছে স্বামী আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সকলের আহারাদি শেষ হইলে জজ-পত্নী লাবণ্যকে দুই চারিটি

পরামর্শ দিয়া ও হৃষীকেশের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া যাহাতে তিনি অন্যমনস্ক থাকেন এই ভাবের কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন।

লাবণ্য গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তখন হৃষীকেশ গৃহের শৃঙ্খলা ও সযত্ন রক্ষিত তাঁহার পুস্তকাদি ও তৈজসপত্র দেখিতেছিলেন এবং এই ঘোর দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে যে পারিপাট্য ও সামঞ্জস্য সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে লাবণ্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। উপস্থিত তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন ক্ষণেক তাঁহার বিকার ভাব অপসৃত হইয়াছে।

"লাবণ্য! লাবণ্য!"

"কি বলছ?"

"তুমি আমার পুঁথিপত্রগুলো আর জিনিসপত্রগুলো বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছ ত? আমি ভেবেছিলাম বুঝি এগুলোকে পোকায় কেটে ফেলেছে।"

"তোমার জিনিস—তোমার বই—যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছি, এ আর বেশী কথা কি? তুমি সুস্থ হ'য়ে ঘরে থাক, তাহ'লে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।"

"দেখ লাবণ্য, আমার কি হয়েছে জান? থাকি থাকি

মাঝে মাঝে যেন একটা অন্ধকার এসে আমায় গ্রাস করে ফেলে; আমি সব ভুলে যাই। তার পরেই সেই ছেলেটাকে মনে পড়ে। এক-একবার ভাবি সে ত মরে গেছে,—তার জন্য ভাববো না। আবার মনে হয়—"না, সে মরেনি। সীতানাথ আমার ভেলায় চড়ে দামোদরে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে—যেন আমায় ডাকছে। যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সে ঘাটে ফিরে এসে আমায় 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকচে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, দামোদর-তটে ছুটে যাই। তাকে সেখানে পাই না—আবার আমার মস্তিষ্ক বিচলিত হ'য়ে যায়। আমি কি করি, কিছু বুঝতে পারি না।"

"কেন তুমি একটা মরা ছেলের জন্য ভাব? যে গেছে সে আর ফিরবে না। সে আমাদের ছেলে হ'লে বেঁচে থাকতো। সে আমাদের শত্রু—আমাদের কাছ থেকে তার ঋণ ও পাওনা আদায় করতে এসেছিল, আদায় করে নিয়ে চলে গেল। তুমি ভেবো না, ঘরে থাক, নিজের কাজকর্ম্ম কর। আমি তার মা হ'য়ে পাষাণে বুক বাঁধতে পেরেছি, আর তুমি ধৈর্য্য ধরতে পার না?"

উদাসভাবে কতক্ষণ হৃষীকেশ কি ভাবিলেন। তারপর যেন তাঁর চটক ভাঙ্গিল। তখন তিনি বলিলেন—

হাঁ, তাই কর্ব্বো। যেমন করে পারি ধৈর্য্য ধরতেই হবে।

"দোহাই তোমার। তুমি অমন করে উদাস প্রাণে ঘুরে ঘুরে বেড়িও না। আমি অবলা দুঃখিনী। আমার এ সংসারে আপন বলতে কে আছে? তুমি আমার স্বামী—আমার ইষ্টদেব—ইহকাল পরকাল। আমার যে ছেলে মরে গেছে, সে দুঃখে—সে জ্বালায় ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি—পারি কেন—ধৈর্য্য ধরেছি। কিন্তু তুমি যে আমার পোড়া কপাল দোষে এমন হয়ে আছ, এ দুঃখ রাখবার যায়গা নেই।"

"না লাবণ্য, তুমি কাতর হয়ো না। আমি আর ঘুরে ঘুরে বেড়াব না। আমি আর তার কথা ভেবে মন খারাপ কর্ব্বো না। তুমি একটু বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া হৃষীকেশ স্ত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন।

লাবণ্যের বোধ হইতেছিল যেন তাঁহার পা হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। এটা কি স্বপ্ন—এটা কি প্রকৃত জগতের প্রকৃত ঘটনা—না কল্পনা? মধুসূদন! এ শান্তি আমার কতক্ষণের জন্য?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"এখন কি করা যায়? কি উপায় অবলম্বন করলে কাজটি হাঁসিল হয়—বল দেখি?"

"আজ্ঞে, ঐ সেধো বেটাকে প্রথম স্থানান্তরিত করা চাই।"

"তার পর?"

"তার পর ঐ পাগলাটাকে নিয়ে আবার নূতন বিপদ—তার একটা উপায় করতে হবে।"

"কি রকম?"

"পাগলটা এখন প্রায়ই দিনরাত বাড়ীতে থাকে। মাগীর তাই আবার পুরাণ পীরিত জেগে উঠেছে। আর তার পাগলামোটাও অনেকটা সেরেছে শুনছি।"

"বল কি নাপিত-বৌ?"

"আর বলো কি?"

"তুমি তার পর আর দেখাশুনা করেছিলে?"

"যে যমদূত সেধো ব্যাটা পেছু পেছু ঘুরে বেড়াচ্চে তাতে আমার ওখানে যেতে বড় ভয় করে। তার পর শুনলাম সেদিন রাত্রে কে একজন নাকি ভট্‌চায্যিদের বাড়ীতে গিয়ে জানালা ঠেলেছিল, তাই জজ-গিন্নীর হুকুমে

চারজন ভোজপুরী খোট্টা রোজ রাত্রে ভট্‌চায্যিবাড়ী পাহারা দেয়।”

পাঠক বুঝিয়াছেন—ইহারা কারা? একজন জমিদার দেবেন্দ্রনাথ রায়, আর একজন তাঁহার অতি প্রিয় নাপিত-বৌ। নাপিত-বৌয়ের শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া দেবেন্দ্র-নাথের মুখ মলিন ও শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বিমর্ষভাবে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হস্তোপরি ক্ষণেক কপোল ন্যস্ত করিয়া চিন্তার পর তিনি ডাকি-লেন—

“কে আছিসরে? ম্যানেজার বাবুকে খবরদে।” তার-পর নাপিত-বৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

“দেখ নাপিত বৌ! দেবেন্দ্রনাথ যখন জিদ ধরেছেন তখন ঐ হারামজাদা সেধো কি জজবাবু কি কর্ব্বেন! আমার সর্ব্বস্ব যায়—সমস্ত জমিদারী যায় আমাকে ভিক্ষা করতে হয় সেও ভাল তবু আমার কথা রাখতে হবেই।—হাতীকা দাঁত-মরদ্‌কা বাত—লাবণ্যকে চাই। দেখা যাক, কে কি করতে পারে?”

অনতিবিলম্বে হরনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া বাবুর সম্মুখে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। বাবু একটু বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যের বাকি খাজনার নালিশ করা হয়েছে ?

হর—আজ্ঞে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই মত সমন গোপন করে একতরফা ডিক্রী করা হ'য়েছে।

দে—ভাল। ডিক্রী জারি করে তাহার জমি ক্রোক নিলামে চড়াও নি কেন ?

হর—আজ্ঞে ! সমস্তই প্রস্তুত আছে। আপনার হুকুম হলে কালই জারীর খরচা দিতে পারি।

দে—হাঁ কালই করা চাই ।

হর—যে আজ্ঞে ।

ঠিক এই সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র বাবুর হাতে দিল। বাবু পত্র পড়িয়া একটু চঞ্চল ভাবে হরনাথকে বলিলেন—

ওহে যাও-যাও, শীঘ্র নীচে যাও, বাইজী এসেছে ! তাকে শীঘ্র উপরে নিয়ে এস। অসময়ে হঠাৎ বাইজী এখানে এলো কেন—? কিছু ভাল বুঝতে পারছি না।

হর—আজ্ঞে এই কয়দিন সেখানে যাননি। আমার বোধ হয় একটু কাতর হয়ে দেখা করতে ও সংবাদ নিতে এসেছে। আহা তার প্রতি আজ দিন কতক আপনি একটু কঠোর ব্যবহার করছেন।

কথাগুলি শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। পরে বলিলেন—তাই নাকি ?"

"তা আর আপনি কি বোঝেন না ?"

"তা যাই হোক তুমি গিয়ে নিয়ে এস।"

হরনাথ বিদায় হইল। ইত্যবসরে বাবুর ইঙ্গিত মত নাপিত বৌ গৃহ হইতে সরিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে হরনাথ রুক্ষকেশা ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা দীন-বেশ-ধারিনী বাইজীকে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিল।

একি ? একি পরিবর্ত্তন ? বাইজীর এ কি বেশ ? ঘোর বিলাসিনী আজ সন্নাসিনী বেশে কেন ?

বাইজী ধীরপদে দরজার নিকট আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্রনাথ এসব দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। কিছু বুঝিতে পারিলেন না কি যে বলিবেন তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং বাইজীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—"ডার্লিং! ডার্লিং! একি ? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। কিন্তু এ বেশ কেন তা ত বুঝলাম না। শীঘ্র বল, শীঘ্র বল কি হয়েছে ? আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।"

"নিষ্ঠুর পাষাণ! এমনি করে অবলার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দুঃখ দিতে হয়? আমার মাথার উপর দিয়ে কত ঝঞ্ঝাবাত চলে গেল তার কি কিছু খবর রেখেছ? আমার আজ এদশা কেন? তোমার জন্যই না? এই জন্যইত সবাই বলে বাবুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে নেই। হায়রে কপাল!" এই বলিয়া বাইজী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। প্রকৃত ব্যাপারটা যে কি তাহা জানিবার জন্য মনোভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাইজী! আমার প্রাণেশ্বরি! বল বল কি হয়েছে? তোমার প্রাণে আজ কিসের কষ্ট? এখনি বল। এর প্রতিকার করা চাই নচেৎ আমার নাম মিথ্যা—আমার জন্ম—কর্ম্ম সকলই মিথ্যা।

হরনাথ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—অতি উপযুক্ত কথাই বলেছেন। কার ঘাড়ের উপর এমন রক্ত যে আমাদের বাইজীর উপর অত্যাচার করতে সাহস করেছে? অবলার প্রতি এরূপ ব্যবহারের কথা যে শুনবে তারই রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠবে।

সোহাগভরে দেবেন্দ্রনাথ যখন বাইজীকে নিজের নিকটে

বসাইয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—বল কি হয়েছে ?

বাইজী তখন তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া দেবেন্দ্র নাথের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল—দেখ বলতে লজ্জা হয় অথচ না বল্লে নয় ? আমার মা এখন আমার শত্তুর। হতচ্ছাড়া মাগী মরেও না,কেবল আমাকে চিরদিন জ্বালাবে।

"কেন ? কেন ? মা কি করলে ?"

"দেখ রমাকান্ত দাস নামে নাকি একজন তেলুই পাড়ার জমিদার খুব বড়লোক। সে দিনকতক আগে জুড়ি করে এসে আমাদের বাড়ী নামলো, আমি তাড়াতাড়ি কোথায় তোমায় দেখবো, না একটা কালো জাম্বুবানের মত মর্কটকে গাড়িথেকে নামতে দেখলুম।"

হরনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, যেই শুনিল গাড়ি থেকে নামলো, অমনি বজ্রমুষ্টি ধারণ করিয়া দন্তে অধর চাপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রনাথ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর ?

বাইজী—তারপর আমায় দেখেই একগাল হাসি। মুখে আগুন বেটার। আমার তাকে দেখেই মনে হলো ঘর ঝাড়বার ঝাঁটা দিয়ে দুঘা সপাসপ্ কসিয়ে দিই।

হরনাথ—তা দিলেনা কেন?

দেবেন্দ্র—থাম হরনাথ। তার পর কি হ'লো তাই শুনি।

বাইজী—তারপর আগে থেকে মার সঙ্গে গড়াপিটা ছিল কি না—তা ত আর আমি জানি না। সে আসবামাত্র মা তাকে নিজের ঘরে খাতির করে নিয়ে গেল। কতক্ষণ ধরে দুজনে ফিস্‌ফাস্‌ করে কি বললে তারপর মা আমার কাছে এসে যে জঘন্য প্রস্তাব করলে তা মুখে আনতে লজ্জা করে। মা হয়ে অমন কথা বললে?

দেবেন্দ্র—মা কি বল্লে?

বাইজী—কি বললে জান—মা বললে—দেখ মা কৃষ্ণ-প্রিয়া তেলুইপাড়ার জমিদারের তোর উপর বড্ড ঝোঁক পড়েছে। সে তোর সঙ্গে ভাব ভালবাসা করতে চায়। এর জন্য যত টাকা লাগে সে দিতে রাজী আছে। সে বলে দেবেন্দ্র বাবুকে ছেড়ে দিক, সে পঁচিশ হাজার টাকার গহনা এখনি দিচ্চে, আর মাসে পাঁচশো টাকা ক'রে মাহিনে দেবে। এই ব'লে মা আমার কাছে একটা বাক্স খুলে একরাশ জড়োয়া গহনা দেখালে।

দেবেন্দ্র—তার পর?

বাইজী—আমি ত কথাশুনেই কানে আঙুল দিলাম।

আমি মাকে বল্‌লাম 'যা তুই দূরহ আমার কাছ থেকে আমি যাঁকে স্বামীর মত ভালবাসি ও ভক্তি করি, তুই তাঁকে ছাড়তে বলিস? খানকি কি না তুই শুধু পয়সাই চিনেছিস। তুই ভালবাসার মর্ম্ম কি জানবি? ওরকম বলবি ত আমি গলায় দড়ি দেব।

হরনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—ঠিক ঠিক।

দেবেন্দ্র—তার পর?

বাইজী—তারপর আমার উপর ক্রমে ধমক, প্রহার ও নির্যাতন আরম্ভ হল। দেখবে—এর প্রমাণ দেখবে? এই বলিয়া তাহার নিজের পৃষ্ঠদেশে একটা বড় ক্ষত দেখাইয়া দিল।

দেবেন্দ্র—তারপর?

বাইজী—এইরকমে দিনকতক গেল। তুমি ত আর একবার দেখও না। অবশেষে মা বললে—হয় আমার কথা শোন, না হয় একবস্ত্রে যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যা।

দেবেন্দ্র—হাঁ, বুঝেছি। তার পর?

বাইজী—শেষে তার কথায় রাজি না হওয়ায় আমাকে দরবান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দিলে। বল্লে আমার বাড়ী আমি তোকে থাকতে দেব না—তুই বেরো।

হরনাথ—আচ্ছা বেশ। তা না হয় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে, তা তোমার কাপড় চোপড় গহনাগাটি দেবে না কেন ?

বাইজী—তা কি আমি চাইনি ?

দেবেন্দ্র—তাতে কি বললে ?

বাইজী—বললে—তুই আমার বাড়ীথেকে বেরো আমি কিছু দেব না—তুই যা পারিস করিস—আদালতে আমার নামে নালিশ করিস—আমি এক পয়সাও দেব না।

দেবেন্দ্র—আচ্ছা। দেখা যাক কত ধানে কত চাল। এর ব্যবস্থা আমি করছি। কি বল হরনাথ এর একটা ব্যবস্থা করা চাই।

হরনাথ—আজ্ঞে তা আর একবার বলছেন ? মাগীর যতবড় মুখ ততবড় কথা। আমাদের আদালত দেখাতে এসেছে। মাগীকে জেলে পুরবো তবে ছাড়বো।

দেবেন্দ্র—আচ্ছা ভেবে চিন্তে এর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। উপস্থিত বাইজীর আহারের ও বিশ্রামের একটা বন্দোবস্ত করে দাও। আর তুমি সন্ধ্যার পরই আমার সঙ্গে দেখা করো, যেন ভুলো না। এই বলিয়া দেবেন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

হরনাথ—যে আজ্ঞে।

দেবেন্দ্রবাবু গৃহ ত্যাগ করিলে পর হরনাথ বাইজীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"বাইজী! বাইজী। তুমি খুব বড় একট্রেশ হতে পারবে। তোমার চোকের জল ও এই অভিনয়ের কায়দা দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি।"

বাইজী—ওসব আমাদের ছেলেবেলা থেকে শেখা ঠাকুরপো। আমাদের দোকান খোলবার আগে মা একটা পরীক্ষা করে তবে ব্যবসায় নামতে দেয়। সেটা কি জান?

হরনাথ—সেটা কি?

বাইজী—মা পরীক্ষা করবার জন্য বলত আচ্ছা হাস দেখি। আমরা হাসতাম। তারপর হাসি থামতে না থামতে বলত আচ্ছা কাঁদত বেটি। অমনি চোকের জল ফেলে কাঁদতে হোত। এই পরীক্ষাটি আপনাদের এম্ এ পরীক্ষার চেয়েও কঠিন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মা মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে দোকান খুলতে হুকুম দেয় আর বলে যে এ মেয়ে নিশ্চয়ই বড়লোক হবে, বুঝলে? কাজেই ওরূপ অভিনয় আমরা বাল্যকাল থেকে শিখে আসছি।

হরনাথ—বা বেশ। অবাক করলে বাইজী। যা হ'ক এখন চল। আদত কাজটি হাসিল করবার চেষ্টা করি গে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জজবাবু রাজাদেশ মত মেদিনীপুর জেলায় বদলী হইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের একটা প্রধান কণ্টক আজ দূর হইয়াছে। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে আজ বিপুল আনন্দ। জজবাহাদুর স্থানান্তরিত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ আমলা কর্ম্মচারী সকলকেই বিশেষ সাধুচরণকে লাবণ্যের ও হৃষীকেশের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন।

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য যদিও এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু এখন তাঁহার মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। কখন কখন বেশ স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্যাদি করিবার জন্য মনকে নিয়োজিত করেন আবার কখনও বা খেয়াল মত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিজমনে কি ভাবিতে ভাবিতে কোথায় চলিয়া যান। লাবণ্য তাঁহার স্বামীর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া কতকটা আশ্বস্তা হইয়াছিলেন এবং সময়ে যে স্বামী সম্পূর্ণ আরগ্য লাভ করিবেন এই আশা প্রাণে পুষিয়া ছিলেন। কিন্তু আজ হঠাৎ তিন চারিদিন হৃষীকেশ নিরুদ্দেশ হওয়ায়

তিনি অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কি যে করিবেন তাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সাধু ও জজবাবুর ভৃত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদ আনিতে পারে নাই। সকলই হৃষীকেশের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই।

আজ লাবণ্যের গৃহপার্শ্বে বিস্তর জনতা হইয়াছে। পাড়ার আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ব্যাপার কি? আদালতের পিয়াদা, বেলিফ দেবেন্দ্রনাথের কারপরদাজ, বরকন্দাজ ভৃত্য—লোকে লোকারণ্য। সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তৎপর কিন্তু আদালতের লোকের সম্মুখীন হইয়া কেহ প্রশ্ন করিতে সাহসী হইতেছে না। ক্ষণেক পরে বেলিফ মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারীর সনাক্ত মত হৃষীকেশের সদর দরজায় আসিয়া ডাক দিল। গৃহমধ্যে একমাত্র অধিকারিণী লাবণ্যময়ী তখন ঠাকুর ঘরে বসিয়া একমনে দেবতার পূজায় নিবিষ্টা। বাহিরের কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। অনেক ডাক হাঁকের পর যখন অন্দর হইতে কোন সাড়া বা উত্তর আসিল না তখন বেলিফ নিজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে অসহায়া অবলা লাবণ্যের ক্ষুদ্র ভগ্ন বাটীর মধ্যে প্রবেশ-

পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল—“বাড়ীতে কে আছ গা ?”

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া লাবণ্যের চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। বেলিফ মহাশয়ের ও দেবেন্দ্রনাথের ভৃত্যদের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব ধারণ করিল। তাহাদের দেখাদেখি গৃহমধ্যে অনেক প্রতিবাসী ও বাজে লোক আসিয়া জনতা বাড়াইতে লাগিল। একটা অভাবনীয় ঘটনা ও অমঙ্গল ঘটিতেছে ভাবিয়া লাবণ্যদেবী তাড়াতাড়ি নিজের ইষ্টদেবতার পূজা সমাপন করিয়া ঠাকুর ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন; আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ সম্মুখে বজ্রপাত হইলে তিনি ততটা বিচলিত হইতেন না। হঠাৎ নিজ পদমূলে কাল ফণী জড়াইলে তিনি ততটা অধৈর্য্য হইতেন না। রোষে, ক্ষোভে, অপমানে ও লজ্জায় তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। তিনি ইহাদের দেখিয়া তাঁহার মলিন ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রখানিতে ঘোমটা টানিয়া দিয়া গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় ও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কি করিবেন—কাহাকে ডাকিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সাধু কোথায় ?

বেলিফ লাবণ্যের অবস্থা দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত

হইল। তখন তিনি ভিড় সরাইয়া দিয়া লাবণ্যের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"দেখুন, আমি আদালতের লোক। আপনার স্বামী হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় বাকী খাজানার নালিস করে পঞ্চাশ টাকার ডিক্রী করেছেন। ডিক্রীর টাকা আদায় না দেওয়ায় তিনি আদালত হ'তে ক্রোক পরোয়ানা বাহির করে জারী দিবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। এখন যদি আপনি ডিক্রীর টাকা জমা দিতে পারেন তা হ'লে আর কোন গোলমাল থাকে না নচেৎ আমি ঐ ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্য আপনার ঘর বাড়ী জমি ও আসবাবপত্র সমস্ত ক্রোক করব।

লাবণ্য উদ্‌গ্রিব চিত্তে সমস্ত কথাগুলি শুনিলেন। কিন্তু এ বিপদে কি যে করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। বেলিফ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল না তখন অগত্যা ডিক্রীদার দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারীদের বলিল—"দেখুন! আমার মতে ঘরের জিনিষপত্র ক্রোক করার দরকার নেই ডিক্রীর টাকাত আর বেশী নয়, এ অবস্থায় ঐ পতিত জমিটা ক্রোক করলেই আপনাদের টাকা সম্পূর্ণ আদায় হবার সম্ভাবনা।

তখন দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারী তিনকড়ি মণ্ডল বলিয়া উঠিল—বলেন কি মশাই? বাবুর হুকুম স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আছে সমস্তই ক্রোক করতে হবে। বাবুর অমতে কাজ ক'রে শেষে কি খুনের দায়ে পড়বো?

বেলিফ—আরে বাবুকে বুঝিয়ে বললেই হবে? এতে ত আর তাঁর কোন ক্ষতি হ'চ্ছে না।

কর্ম্মচারী মণ্ডল মহাশয় তখন সদর্পে বলিয়া উঠিল—না মশাই না—তা হবে না। লাভ বা লোকসান দেখে কাজ করবার কারো ক্ষমতা নাই—তাঁর হুকুম তামিল করা চাই। আপনার ঐ টুকটুকে ছুঁড়িটাকে দেখে মনটা ভিজে গেল নাকি? আপনি বুঝছেন না ঐ মাগী কিরকম চালাক। ঘোমটা টেনে ভিজেবেড়ালটির মত চ'লে গেল আর ভিতরে ভিতরে জিনিষপত্রগুলি অন্যত্র সরাচ্চে। আপনি কোন ওজর করবেন না। শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিজের কাজ সমাধা করুন।

ইহাদের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন লাবণ্য নিরুপায় হইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে আসিলেন ও একবার দেবর হরনাথের অন্দরে গমন করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যে এই বিপদে হয়ত হরনাথ তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পাগল

স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। কিন্তু যাহার প্রতি বিধি বাম, তাহার প্রতি সকলেই বিরূপ হয়। দেবর-ভবনে গিয়া লাবণ্য একেবারে হরনাথের স্ত্রীর নিকট গিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ছল ছল নেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিলেন—বৌ! বৌ! আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আজ তুমি না রাখলে আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। এই বলিয়া বৌএর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। বৌ তখন তাহার কন্যা সুরবালার পুতুলের জামা সেলাই করিতে ছিল। লাবণ্যকে দেখিয়া ও তাঁহার কাতরতায় সে বিশেষ বিচলিত হইল না। সে শুধু বলিল—দিদি কি হয়েছে? কি বলছ, আমি ভাল বুঝতে পারছি না।"

"বৌ! জমিদার বাবুর খাজানা দিতে না পারায় আমাদের বাড়ীতে আদালতের লোক এসে ক্রোক দিচ্ছে। এখন নাকি পঞ্চাশ টাকা না দিলে আমাদের বাড়ী ঘর জিনিষপত্র সমস্ত নিলাম ক'রে নিয়ে আমাকে বাড়ীর বার করে দেবে। বৌ কি হবে? ঠাকুর পো কোথায়?"

"তাইত দিদি! তোমার ঠাকুরপো আজ সকালে জমিদার বাবুর কাজে কল্‌কাতায় গেছেন। তিনি বাড়ী নেই আমি কি করবো?"

"বোন তুমি না রাখলে কে রাখবে? তুমি না হয় আমায় পঞ্চাশটা টাকা ধার দাও।"

"দিদি! আমার হাতে উনি এক পয়সাও দেন না যে দেবো, সব তাঁর নিজের হাতে। তাইত আমি কি করি? তবে যদি গহনা দু'একখানা দিতে পার তাহ'লে কোনখান থেকে ধার ধোর করে এনে দিতে পারি।"

"বৌ যার আজ রাত পোহালে কাল কি খাবে তার স্থির নেই সে গহনা কোথায় পাবে?" এই বলিয়া লাবণ্য ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হরনাথ-পত্নী তখন কথাটা চাপা দিবার মানসে বলিল —দিদি! আমারই কি মনে সুখ আছে? আজ তিন দিন ধরে মেয়েটার জন্য মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে; তাতে আমার কিছু ভাললাগছে না।" এই বলিয়া সে সূচের কার্য্য বন্ধ করিয়া নিজ গুরুনিতম্বের উপর সোণার বিছাটির বাহার জাহির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

লাবণ্য বলিয়া উঠিলেন—বৌ! কোথা যাও—আমার কি হবে?

"কি আর হবে দিদি? আমি কি কর্ব্বো? আমার সুরোর সইএর জন্য প্রাণটা কেমন করছে। আহা দিনরাত এখানে এসে খেলা করতো, সুরোর সঙ্গে কত ভাব ছিল।

মেয়েটা একদিনের জ্বরে মরে গেল। আহাহা মেয়ে ত নয় যেন দেবকন্যা। আমার সুরো তার শোকে তিনদিন জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি গো। এখন সে কি করে বাঁচবে তাই ভেবে ভেবে আমি সারা।" এই বলিয়া হরনাথ-পত্নী ডাক ছাড়িয়া কান্নার সুর তুলিল—"হতভাগী তোর কপালে এত দুঃখ? আমি যে আর সইতে পারি না।" কান্না শুনিয়া দাসী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"ও মা তুমি এমন কচ্ছ কেন গো? এখনি আবার ফিটের ব্যারামটা চাগাড় দিবে যে? চল বিছানায় একটু শোবে চল। আমি মাথায় গোলাপজল দিয়ে দিই ও বাতাস করিগে চল।"

তার পর লাবণ্যকে উদ্দেশ করিয়া দাসী বলিল—যাও বাছা—এখন বাড়ী যাও। মাঠাকুরুণের ব্যারাম বেড়েছে। তুমি অন্য সময়ে এসে কথাবার্ত্তা ক'ও।

লাবণ্য প্রাণের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া নিজ ভবনে ফিরিলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"কোথায় করুণাময়? কোথায় মধুসূদন? এ বিপদে অবলার কে সহায় হবে প্রভু? মানুষের দুঃখ মানুষে ত বোঝে না। তুমিও কি অভাগীর দুঃখ বুঝবে না? তবে কি শুধু জ্বালা দিবার জন্য এই হতভাগীকে এ সংসারে পাঠিয়েছ? আর যে সহ্য হয় না

প্রভু! এ কাঙ্গালিনীর দুঃখ কে বুঝবে দয়াময়? কাঙ্গালের হরি তুমি সবইত কেড়ে নিয়েছ, এখন প্রাণটি কেড়ে নিয়ে আগুনের জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি কর। আমি আর যে ধৈর্য্য ধরতে পারি না।

লাবণ্যের গণ্ডবহিয়া অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তারপর আবার ভাবিতে লাগিলেন—না হরি তোমায় আর ডাকবো না। এ বিপদে কি নিজে আমি নিজের উপায় করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি আজ তাই করবো। এ সঙ্কটে মনুষ্যের নিকট করুণা ভিক্ষা করা আর অরণ্যে রোদন করা দুই সমান। আর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না। দেবতা নির্দ্দয়—মানব নিষ্ঠুর—জগৎ কঠিন। তবে কিসের জন্য সংসারে আর থাকব? কিসের জন্য প্রাণের মমতা? আজ উদ্বন্ধনে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত জ্বালা নিবাব।

যখন নিজভবনে আসিলেন তখন গিয়া দেখেন যে দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারীদের উৎসাহে বেলিফ কর্ত্তৃক হৃষীকেশের গৃহস্থিত সযতনে সংরক্ষিত যাবতীয় সামগ্রী পুঁথি তৈজসপত্র বাহিরের প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইতেছে। তাঁহার সাধের ক্ষুদ্র নীড়খানি অত্যাচার-কলঙ্কিত-কঠিন-কলুষমাখা হস্তের দ্বারা এইরূপ বিশৃঙ্খল হইতে দেখিয়া

লাবণ্যের হৃদয়ে শেলসম আঘাত লাগিল। লাবণ্য মরিতে প্রস্তুত। মরিবার আগে একবার পাগল স্বামীকে মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন "আমার আর এ জগতে কে আছে? কেন আমার স্বামী—আমার পাগল স্বামীত আছে। আমি মরিলে কে তাঁহাকে দেখিবে? অনাহারে অযতনে তিনি কোথায় দাঁড়াইবেন? তবে কি করি একবার শেষ দেখি। মানুষের নিকট একটা শেষ ভিক্ষা করিয়া দেখিনা কেন? যদি তাহাতে স্বামীর মঙ্গল হয় —যদি স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা হয় তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কি?"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হইয়া লাবণ্য নির্ভীকচিত্তে সদর্পে লোকের সন্মুখিন হইয়া করযোড়ে কহিলেন—"মহাশয়! আমার প্রতি এরূপ নির্যাতন করছেন কেন? আমার স্বামী পাগল। আমি প্রকৃতপক্ষে অভিভাবক শূন্য ব্রাহ্মণ-ঘরণী। পথের ভিখারী হ'তেও আমি গরিব। যদি জমিদার বাবুর পাওনাই থাকে তবে আমাকে কিছু সময় দিন, আমি যেপ্রকারে পারি স্বামীর এই ঋণ পরিশোধ করব। জমিদার বাবু বড়লোক, সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্য তিনি অনায়াসে আমাকে কিছুদিনের সময় দিতে পারেন। তাতে তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

অথচ এই একটি দরিদ্র সংসার রক্ষা হয়।"

বেলিফ স্থিরচিত্তে কথাগুলির সার্থকতা মনে মনে বুঝিল। কিন্তু উত্তরে বলিল—আপনার কথাগুলি যুক্তি-পূর্ণ হলেও আমি সেই মত কার্য্য করতে অক্ষম। আপনি স্ত্রীলোক আমার কর্ত্তব্য যে কি তা জানলে আমাকে এরূপভাবে অনুরোধ করে লজ্জা দিতেন না।"

"দেখুন, আমি হিন্দুরমণী। আদালতের নিয়ম আমি জানি না—আর জানবারও আমার বিশেষ আবশ্যক নাই, তবে আমার মত নিরন্ন ভিখারিণীকে পথে দাঁড় করান যদি আদালতের আইনের উদ্দেশ্য হয় ও তাতে যদি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় তা হ'লে আমার অধিক বলবার কিছু নাই।"

দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারীগণ এই কথাগুলি শুনিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে দুই চারিটি বিদ্রূপ সূচক বাক্য বলিতেও ছাড়িল না।—"একি মামার বাড়ীর আবদার না কি? এ বড় শক্ত ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই বুঝলে?" তারপর বেলিফকে উদ্দেশ করিয়া তিনকড়ি মণ্ডল বলিল—"মশাই, মাগী হয় টাকা দিক না হয় ঘরথেকে যেখানে ইচ্ছা বেরিয়ে যাক্। আপনি আইন অনুসারে কার্য্য করুন।"

বেলিফ লাবণ্যের আর্ত্তনাদে কতকটা মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু একে সে রাজকর্ম্মচারী তাহাতে আবার প্রতাপান্বিত জমিদার দেবেন্দ্রনাথের কাজে সে নিয়োজিত হইয়াছে। এই কারণে সে নিজ ইচ্ছামত কোন কাজ করিতে সাহসী হইল না। অগত্যা সে বলিল—ডিক্রীদারের লোক রাজী না হ'লে আমি কিছুই করতে পারব না, আমার অপরাধ নেবেন না।

লাবণ্য আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় সগর্ব্বে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্গল আবদ্ধ করিবেন এমন সময় নাপিত-বৌ ভিড় ঠেলিয়া লাবণ্যের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। কপাটের নিকট গিয়া ডাকিল—"বৌ! বৌ দরজা খোল। শোন একটা বিশেষ কথা আছে।"

লাবণ্য প্রথমে ভাবিল বুঝি কোন প্রতিবেশিনী তাঁহার উপকারার্থে আসিয়াছে। কিন্তু কপাট খুলিয়া নাপিত-বৌকে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কাতরকণ্ঠে লাবণ্য বলিলেন—নাপিত-বৌ! আমি তোমার কি শত্রুতা করেছি যে তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে মরতেও দেবে না?

উত্তর শুনিয়া নাপিত-বৌ বলিয়া উঠিল—ছি ছি ষাট্ ষাট্ একি কথা। যার অমন রূপ, যার জন্য দেশের রাজা

রাজড়ারা পাগল, তার আবার দুঃখ কি? দেখবে বৌ—দেখবে? এই দেখ জমিদার বাবু নিজেই ডিক্রী করেছেন আবার নিজেই তোমাকে এই একশো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমার বড় হিতাকাঙ্ক্ষী গো। তিনি তোমায় দেখে অবধি পাগল হয়েছেন। এই নাও টাকা-গুলো—নাও, নিয়ে এইসব ঝামেলা বিদায় করে দিয়ে চল আমরা দুজনে বসে একটু পরামর্শ করিগে।

কুপিতা ফণিনীর ন্যায় লাবণ্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দূর হ, পিশাচী! দূর হ শয়তানী—বেরো এখান থেকে—বেরো।

ভয়ে নাপিত-বৌ অধিক কিছু বলিতে পারিল না, ও অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে পারিল না। পুণ্যের কাছে পাপ কতক্ষণ থাকিতে পাবে? কাজেই নাপিত-বৌ বিদায় লইবার সময় অস্ফুটস্বরে বলিল—মাগীর মরণবাড় বেড়েছে কি না? ভাল করতে গেলাম মাগীত তা বুঝলে না। অচ্ছা দেখা যাক কত তেজ এ তেজ আমি ভাঙ্গব তবে আমার নাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যখন বেলিফ ও দেবেন্দ্রনাথের আমলাবর্গ কর্ত্তৃক হৃষীকেশের জীর্ণ কুটীরখানি পরিবেষ্টিত হইল, তখন সাধুর কন্যা চাঁপা বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাদের ধান্যক্ষেত্র অভিমুখে দৌড় দিল। কারণ তখন তাহার পিতা লাঙ্গল ও গরু লইয়া জমিতে চাষ দিতে গিয়াছিল। অসময়ে কন্যাকে ক্ষেত্রে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া সাধু একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছিল। চাঁপাকে দেখিয়াই সে দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"কি রে চাঁপা! কি হয়েছে? এই দুপুররোদ্দুরে দৌড়িয়ে আসচিস কেন?

"ওগো বাবাগো কি বলবো গো? ভট্‌চায্যি মশাই-দের বাড়ীতে ডাকাত পরেছে গো। সব লুটপাট করে নিয়ে গেল এতক্ষণে সব নিয়ে গেল বোধ হয়।"

"এঁ্যা বলিস কিরে? এই দিনদুপুরে ডাকাতী? পাড়ার কেউ কিছু আটকালে না?"

"না বাবা। তুমি শিগ্‌গীর এস আমার ভয়ে গা হাত পা কাঁপছে।"

"আমার মা জননী কোথায়?"

"তা জানি না বাবা! তুমি শীগ্‌গীর চল।"

সাধু চাঁপার কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সে অনুমানে বুঝিতে পারিল, এবং তৎক্ষণাৎ লাঙ্গল হইতে গরু দুইটিকে ছাড়িয়া দিয়া লাঙ্গলটা ঘাড়ে করিয়া সাধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অভিমুখে দৌড় দিল কিন্তু দৌড়িবার পূর্ব্বে চাঁপাকে বলিল—চাঁপা আমি যাচ্ছি। তুই গরু দুটোকে তাড়িয়ে গোয়াল ঘরে নিয়ে যা।

এই বলিয়া সাধু মল্লকচ্ছ বাঁধিয়া ঘাড়ে লাঙ্গল করিয়া দৌড়িতে লাগিল। যখন সে প্রায় জজবাবুর ফটকের কাছে আসিল তখন জজবাবুর জমাদার রামলোচন তেওয়ারীকে ডাকিতে ভুলিল না। তখন তেওয়ারী খাঁটিয়া পাতিয়া আরামে ঘুমাইতেছিল। সাধু আসিয়াই প্রথমে চীৎকার করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তেওয়ারীর ঘুম সহজে ভঙ্গ না হওয়ায় সাধু তাহার লাঙ্গলফলক-সংলগ্ন সুবৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডটির দ্বারা তেওয়ারীর বিশাল বপুর উপর আঘাত করিল। স্বল্পাঘাতে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া সাধু অধিক বলের সহিত তেওয়ারীর বৃষস্কন্ধের উপর পুনরায় আঘাত করিল। তেওয়ারী প্রত্যহ কুস্তি করিত ও তাহার গুটিকতক চেলা

বা সাকরেদ ছিল। অনেকেই তাহাকে রামলোচন: পালোয়ানজী বলিয়া ডাকিত। সাধু পুনরাঘাত করিলে তেওয়ারীর স্বল্প চৈতন্য লাভ হইল বটে কিন্তু সে চক্ষু উন্মীলিত না করিয়া বলিল—"জোরসে বেটা য্যারা জোরসে" তেওয়ারী মনে মনে ভাবিয়াছিল যে তাহার কোন সাকরেদ তাহাকে দলাই মলাই করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতেছে। তখন সাধু আর থাকিতে পারিল না। তাহার কর্ত্তব্য অনেক বাকী রহিয়াছে, সে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে না। অগত্যা কতকটা বিরক্ত হইয়া ধপাস্ ধপাস্ শব্দে সজোরে দুই চারিবার আঘাত করিলে পর তেওয়ারী ওরফে পালোয়ানজী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিয়া উঠিল—"কোন হ্যায় রে?

সাধু উত্তর করিল—তেওয়ারী আমি।

চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় তেওয়ারী জিজ্ঞাসা করিল—হামি, আরে তোম কোন হ্যায়?

"আরে চোখটাই খোল। আমি সাধু! শিগ্গীর ওঠ। ভট্‌চায্যি মশাইদের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে আর তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুম লাগিয়ে শুয়ে আছ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী ডাকাত পড়িয়াছে শুনিয়া তেওয়ারী চক্ষু চাহিয়া উঠিয়া বসিল। সাধুর ডাকাত ধ্বংস

করিবার সাজ-সজ্জা ও আয়োজন দেখিয়া তেওয়ারী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল— আরে তোম ক্যায়া পাগ্‌লা হুয়া ?

"না, না তেওয়ারি! আমি পাগল নই। তুমি শিগ্‌গীর তোমার লাঠিটা নিয়ে এস! আমি এগুই।" এই বলিয়া সাধু লাঙ্গলটি ঘাড়ে লইয়া জজবাবুদের ফটক দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর দিকে দৌড় দিল।

সাধুর কথা তেওয়ারী ভাল বুঝিতে পারিল না। তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে বিপদ হইয়াছে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সাধের খাটিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের পরিহিত বসন খানি কোমরে উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাহার লৌহগুল বসান ছয় হস্ত লম্বা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া "কোন হায়রে" "শালা ডাকু" "কাঁহারে" প্রভৃতি সকার বকার সংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে সাধুর অনুসরণ করিল।

এদিকে লাবণ্য ঠাকুর ঘরে দরজায় অর্গলাবদ্ধ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। কড়ি-কাট হইতে রজ্জু সংযোগে একটা বংশদণ্ড এতাবৎ আলনার কার্য্য করিতেছিল। লাবণ্য সেই বংশদণ্ডটি খুলিয়া ফেলিলেন। লম্বমান রজ্জুতে একটা ফাঁস তৈয়ারি

করিলেন, সমস্তই প্রস্তুত। বাহিরের কোলাহল বা জনরবে তিনি আর কোন সংস্রব রাখিলেন না। এখন এক বার কুলদেবতা জনার্দ্দনদেবের ও প্রাচীর সংলগ্ন শ্যামামায়ের চিত্র সম্মুখে নতজানু হইয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "মা শঙ্করি! মা জননী জানি না কি দোষে এ সন্তানের উপর তোর এত নিগ্রহ। এজগতে দুঃখ রাশি শিরে নিয়ে জন্মেছি—অভাগীর কপালে আর সুখ দেখা দিল না। তোরই চরণ স্মরণ করে আর আমার ইহকাল পরকাল উন্মাদ স্বামীর চরণ স্মরণ করে এত দুঃখকষ্টে মাগো আমি সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলাম। জননি! তাও তোর সহ্য হল্লো না। আমি অবলা—অনাথা আর সইতে পারি না মা। জানি আত্মহত্যা মহাপাপ। মহাপাপ করলে নরক যন্ত্রণা ভুগতে হয়। মা এ সংসার-যাতনার চেয়ে কি নরক যন্ত্রণা ভীষণ? তা হয় হ'ক, এ পাপ মানুষের পুরীতে আর থাকতে পারি না। সন্তানের অপরাধ নিও না মা। এজীবনে বড় জ্বালা—এজীবনে বড় কষ্ট। তোর দয়া কিছুতেই হলো না। তবে আর কেন? বড় সাধে স্বামীর ঘরে এসেছিলাম—বড়সাধে কুঁড়ে বেঁধেছিলাম—না, আর নয় সব সাধ মিটেছে মা, তুই পাষাণী তোর যা ইচ্ছা

কর, আর তোকে ডাকবো না।" এই বলিয়া বার বার কাষ্ঠসিংহাসনস্থিত কুলদেবতার সম্মুখে ও শ্যামামায়ের চিত্র সম্মুখে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, সহস্রবার প্রণাম করিলেন। তার পর একমনে উন্মাদ স্বামীর চরণ স্মরণ করিয়া উদ্দেশে তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উঠিবার সময় শুধু বলিলেন "একবার শেষ দেখা হলো না।"

এই বার লাবণ্যের জীবনের শেষ কার্য্যটুকু করিতে বাকি। ভূমিতলে দাঁড়াইয়া রজ্জুতে গলা প্রবেশ করান কঠিন ভাবিয়া লাবণ্য মনে মনে স্থির করিলেন যে দেবতার সিংহাসন তলে যে উচ্চ এবং বিস্তৃত কাষ্ঠচৌকি আছে তাহারই প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া ফাঁস গলায় বাঁধিবেন। কিন্তু জনার্দ্দনদেবের শালগ্রাম মূর্ত্তি সিংহাসন উপরে স্থাপিত। তৎসংলগ্ন চৌকির উপর দাঁড়াইয়া একার্য্য কেমনে করিবেন? হিন্দুরমণী হইয়া শালগ্রাম স্পর্শ করিবেন কিরূপে?- স্পর্শ করিলে কি হইবে? পাপ। আত্ম-হত্যার চেয়ে মহাপাপ আর কিছু আছে কি? হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া লাবণ্য এই উপায়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন। সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া লাবণ্য যেমন কাষ্ঠচৌকির উপর পদ-নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া নিজ বামপদ বাড়াইয়াছেন অমনি

লাবণ্যের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। একি দেখিতেছেন? এ কি? প্রাচীর সংলগ্ন চিত্রমূর্ত্তি সজীবরূপ ধারণ করিয়া উলঙ্গিনী এলোকেশী স্নেহমাখা সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজবাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন—"ছি, ছি মা এমন কাজ কি করে? বড় জ্বালা পেয়েছিস—বড় দুঃখ পেয়েছিস। আয় আয় তোর মায়ের কোলে আয়, তোর সব দুঃখ শেষ হবে।"

একি প্রহেলিকা না সত্য? একি মস্তিষ্কের বিকার—না প্রকৃত জগতের প্রকৃত ঘটনা। লাবণ্য আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। "মা মা জননী রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া লাবণ্য ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ

"বেরো শালারা বেরো, বেরো শালারা শিগ্‌গীর বেরো নইলে সব খুন কর্ব্বো" এই বলিয়া সাধু উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে লাঙ্গলের প্রান্তভাগ ধরিয়া লৌহফলকটি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ

করিল। এইস্থানে দাঁড়াইয়া বেলিফ মহাশয় ও দেবেন্দ্র-নাথ রায় জমিদার মহাশয়ের কর্ম্মচারিগণ তাহাদের কর্ত্তব্য সাধিতে ছিলেন। হলধরবেশী সাধুর এই উন্মত্ততা দেখিয়া বাহিরের লোক যে যেখানে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। সকলেই ভয়ে জড়সড় হইল। বেলিফের বুঝি কর্ত্তব্য করিতে আসিয়া বেঘোরে প্রাণটি যায়। সেত বেগতিক দেখিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

এদিকে নাপিত-বৌ সাধুর এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণভয়ে ভট্টাচার্য্যদের ডোবার পার্শ্বে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইতে গেল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব। ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতে তাহার পদ-স্খলন হইয়া সে একটা মাংসপিণ্ডের মত গড় গড় করিয়া ডোবার জলে পড়িয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারীরা হরিষে বিষাদ গণিল। "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মন্ত্রের সার্থকতা বজায় রাখিয়া যে যেরূপ সুবিধা বুঝিল সে সেই রূপ দৌড় দিল। কিন্তু দৌড়দিয়াও নিস্তার পাইল না। তাহারা যেই সদর দরজা পার হইয়া যাইবে অমনি দেখে কালান্তক যমসদৃশ তেওয়ারী তাহার সেই বংশদণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। দরজার নিকট আসিয়াই "কৈঁওরে

বদমাস" এই বলিয়া প্রধান নেতা তিনকড়ি মণ্ডলের পাদ মূলে একটি আঘাত করিল। তিনকড়ি মণ্ডল "বাবারে গেছিরে" বলিয়া সেই খানে শুইয়া পড়িল।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের দল ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। তখন পাড়ার দুই চারি জন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি ও জজ বাবুর প্রজারা সব আসিয়া পড়িল। তাহারা দেখিল যে আদালতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধু ও তেওয়ারী আইনসঙ্গত কাজ করে নাই। অচিরে তাহাদের একটা বিপদ হইতে পারে। এজন্য তাহাদের মধ্যে দুই একজন মধ্যস্থতা করিল। যখন সাধু ও তেওয়ারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্দর হইতে ভিড় সরাইয়া দিল তখন জজ বাবুর প্রজার মধ্যে উপস্থিত শ্রীশদাস আসিয়া বেলিফের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রমুখাৎ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সাধুকে উপস্থিত অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া গোপনে দুইচারিটি সৎপরামর্শ দিয়া চলিয়া গেল।

তখন সাধু তাহার মাজননীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই কথা শুনিয়া বলিল "লাও লাও কি হবে? না হয় দুমাস জেলই খাটবো। তা ব'লে কি আমার মাকে বে ইজ্জত হ'তে দেব?"

এই সময়ে জমিদারের একজন লোক এক পার্শ্ব হইতে

বলিয়া উঠিল—ব্যাটার ভারী মুরদ, শ্রীঘরে পাঠিয়ে যখন ঘানিতে জুড়ে দেবো তখন বেটার কত তেজ দেখা যাবে।

বেলিফ আদালতের লোক হইলেও একেবারে হৃদয় শূন্য ছিল না। সে এই সব দেখিয়া বিশেষ লাবণ্যের আর্থিক ও মানসিক দুরবস্থার বিষয় লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল। এই কারণে যদিও সাধুর উত্তেজনায় সে হৃষীকেশের তৈজসপত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল, তথাপি হৃদয়ে কোনরূপ নীচ প্রতিহিংসার ভাব আনে নাই। এই ঘটনায় বরং লাবণ্যের প্রতি তাহার সহানুভূতি বৃদ্ধি হইয়া গেল। এই জন্য সে সাধুকে একটু প্রকৃতিস্থ হইতে বলিয়া ইঙ্গিত করিল যে, তাহারা যদি ডিক্রীর টাকা কোন রকমে পরিশোধ করে তাহা হইলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। সাধু সমস্ত বুঝিল। তখন তেওয়ারীকে ডাকিয়া লাবণ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া নিজ কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ টাকার যোগাড় করিতে বলিল।

তাহার স্ত্রী অত টাকা কোথায় পাইবে? টাকার কথা শুনিয়া সাধুর স্ত্রী বলিল—ভগবান আমাদের গরীব ক'রে-

ছেন। পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাবো? এই আকালের বৎসর খাজানার টাকারই যোগাড় হয়নি তা আবার পঞ্চাশ টাকা।

সাধু নিজের অবস্থার বিষয় সমস্তই জানিত। সাধু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এমন সময় তেওয়ারী আসিয়া তাহার মাজননীর সংবাদ দিল। তেওয়ারী বলিল যে, লাবণ্য ঠাকুর ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

শুনিয়াই সাধু টাকা সংগ্রহ স্থগিত রাখিয়া তাহার স্ত্রী ও কন্যা চাঁপাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাজননীর নিকট উপস্থিত হইল। গিয়া দেখে তেওয়ারী বংশ যষ্টির সাহায্যে ঠাকুর ঘরের অর্গল ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক লাবণ্যের অবস্থা দর্শন করিয়াই সংবাদ দিয়াছে। লাবণ্য তথনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তাঁহার বদনে যেন শত সূর্য্যের দীপ্তি বিকশিত হইয়াছে। কি উজ্জ্বল বিভাস! একি পবিত্র মূর্ত্তি! দেবতার পার্শ্বে যেন দেবতারই যোগ্য পারিজাতের সমাবেশ।

"মা জননি! তোমার ছেলে এসেছে। মা উঠ কথা কও। তোমার ভয় কি? দাও মা ছেলেকে চরণধূলি দাওমা, সেধো বেঁচে থাকতে তোমার এ দশা কেন?" এই

বলিয়া প্রথমে লাবণ্যের পদধূলি শিরে লইল। তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিল—ওরে মাগী দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস? মার মাথাটা মাটিথেকে তুলে কোলে নে। তারপর চাঁপাকে আদেশ করিল "যারে চাঁপা যা, জল নিয়ে আয়।"

এমন সময় বেলিফ বলিল "কিগো, কি হবে? টাকা দেবে নাকি?"

সাধু এতক্ষণ টাকার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, বেলিফের কথাশুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। অল্প সেবার পরই লাবণ্যর চেতনা সঞ্চার হইল। চেতনা পাইয়া তিনি চক্ষুরুন্মীলিত করিয়াই বলিলেন "মা মা অভয়া কোথা তুমি?"

দেবেন্দ্রনাথের লোকদের আর ধৈর্য্য ধরে না। তাহারা বেলিফকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেছিল। বেলিফ আবার ডাকিল। তখন তেওয়ারী ও সাধু বাহিরে আসিল। বেলিফ জিজ্ঞাসা করিল "কি করবে?"

সাধু—কি করবো—তাইত, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চাঁপা, চাঁপা এদিকে আয় বলিয়া ডাকিল। নাচিতে নাচিতে চাঁপা আসিয়া হাজির হইল। তখন সাধু চাঁপার হাতে বাক্সের চাবি দিয়া বলিল "যা আমার বাক্স খুলে তোর ও

তোর মার মল, পদক, বাউটি আর যা কিছু খুদকুঁড়ো আছে সব নিয়ে আয়। যা মা যা শীগ্‌গির।"

তারপর বেলিফকে বলিল "দাঁড়ান মশাই একটু সবুর করুন। টাকা এখনি দিচ্চি।"

অনতিবিলম্বে চাঁপা সাধুর অতি কায়ক্লেশে সঞ্চিত সারাজীবনের শোণিত বিনিময়ে গচ্ছিত স্ত্রী-কন্যার কয়খানি অলঙ্কার আনিয়া পিতার হস্তে সমর্পণ করিল। সাধু অলঙ্কারগুলি বেলিফের সম্মুখে রাখিয়া বলিল "মশাই এতে কি আপনার প্রাপ্য টাকা পূরণ হবে না?"

"হ'ক বা না হ'ক। আমি গহনা নিতে পারি না। আমার টাকা চাই।"

"টাকা চাই? তবে তেওয়ারী তুমি এইগুলি বেচে বা বন্ধক দিয়ে ৫০ টাকার যোগাড় কর ভাই।"

ঠিক এই সময়ে পুলিশ কনেষ্টবলগণ ও ইনস্পেক্টর আসিয়া সাধুর হস্তে একখানি ওয়ারেণ্ট দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। অভিযোগ এই যে গত রাত্রে জমিদার বাড়ীতে বিস্তর রূপার বাসন চুরি হইয়াছে, আর সাধুচরণ সেই চোরের নেতা এবং তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে অপহৃত বস্তুগুলির মধ্যে ২।১টা পাওয়া গিয়াছে। অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

সাধুত এসব শুনিয়া অবাক। ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে বাক্য সরিল না। শেষে পুলিশের তাড়নায় আর অধিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পুলিশ তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। বিদায়কালে শুধু তেওয়ারীকে বলিয়া গেল যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয় আর সবদিকে লক্ষ্য রাখে।

নিমেষের মধ্যে গ্রেপ্তার-পরোয়ানার বলে সাধু চোর আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়া বন্দী হইল। ইনস্পেক্টর বাবু তাহাকে থানায় চালান দিলেন। চাঁপা তাহার পিতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে চাঁপার মাতা আসিয়া সেই ক্রন্দনে যোগদান করিল। লাবণ্য তাঁহার মাতৃবৎসল সন্তানের দুরবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল। চারিদিকে ক্রন্দনের রোল, উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস, হাসি শুধু জমিদার দেবেন্দ্রনাথের অনুগত কর্ম্মচারী-দের মুখে, আর হাসির রোল জমিদার বাবুর দ্বিতল কক্ষে।

বলাবাহুল্য তেওয়ারী নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে ও সাধু প্রদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া জমিদার বাবুর ডিক্রীর টাকা মিটাইয়া দিয়া তাহার বন্ধু সাধুর শেষ অনুরোধ

রক্ষা করিল ও অত্যাচার পীড়িতা লাবণ্যের উপস্থিত বিপদের কতকটা কিনারা করিয়া দিল।

যখন তেওয়ারী বেলিফের হস্তে টাকাগুলি গণিয়া দিল তখন বেলিফেরও নেত্রপ্রান্তে ঈষৎ অশ্রুকণা দেখা দিয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"ও মা! ও মা!"

"কেন মা কি বলছ মা? এই যে আমি। কি বলছ একটু বরফ দিয়ে সরবৎ দেব, খাবি?"

"সরবৎ খাবি? ন্যাকা মাগী।"

"তবে কি চাই বাবা বল না।"

"শোন বেটি এদিকে আয়। দেখ আজ বোধ হয় বাবু আসবে। তুই বেটি নীচের ঘরে এক কোণে লুকিয়ে থাকগে। যদি তোকে এ বাড়ীতে দেখতে পায় তাহ'লে সে সব বুঝতে পারবে তাহ'লে একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল হবে বুঝলি?"

"হাঁ বাবা বুঝিছি। আমি নীচের ঘরে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইগে বাপু।" এই বলিয়া বৃদ্ধা বাইজীর মাতা সরাসর নীচের তলায় চলিয়া গেল।

হরনাথের পরামর্শ মত ও বাইজীর অনুরোধে কলিকাতা মহানগরীতে এক খানি বাড়ী বাইজীর থাকিবার জন্য পনের হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া দিয়াছেন কারণ দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে তাহার প্রতি আসক্তি হেতু বাইজী তাহার মাতা কর্তৃক বিনা অপরাধে বিতাড়িত হইয়াছে। এছাড়া বাইজীর ঘর সাজান জিনিসপত্রাদি অলঙ্কার সেও প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। মূল কথা সামান্য একটি চালাকী দ্বারা বাইজী হরনাথের সাহায্যে ও কৌশলে প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি আদায় করিয়া লইল। এই টাকার পূর্ব্বেকার বন্দোবস্ত অনুসারে হরনাথ অর্দ্ধেক দাবী করিয়া আসিতেছে।

বাইজীর বাবু দেবেন্দ্রনাথের আজ আসিবার কথা। পাছে মাতাপুত্রীর সদ্ভাব দেবেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন এই কারণে বাইজী মাতাকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া নিম্নের অন্ধকার কুটীতে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া দিল। অনতিবিলম্বে সদর দরজায় একখানি শকট আসিয়া

লাগিল। অরোহী হরনাথ ভট্টাচার্য্য একটী বৃহৎ ষ্টীল-ট্রঙ্কে হাতে লইয়া একেবারে বাইজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবামাত্র বাইজী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাদর সম্ভাষণে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল—"আজ আমার কি সৌভাগ্য। সব ভালত ঠাকুর পো? ঐ বাক্‌সে কি?"

হরনাথ—আজ একটা বড় জরুরী কাজে এসেছি বৌদি কাজটি সুশৃঙ্খলে হাঁসিল করতে পারলে পরিশ্রম নিষ্ফল হবেনা বুঝলে?"

"কিরকম শুনি।"

"দেখ আমাদের গাঁয়ে সেধো বলে একটা ভারী পাজি বদমাইস ডাকাত আছে। ব্যাটার জ্বালায় প্রজাগুলোকে শাসন করা যায় না। তাই তাকে কৌশলে জব্দ করবার জন্য বাবুতে আমাতে একটা মতলব এঁটেছি, আর সেই কৌশলের বলে তাকে কাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"কি রকম শুনি, ভাল বুঝতে পারলাম না।"

"তার মানে জমিদার বাড়ীর রূপোর বাসন চুরির দাবী দিয়ে ওয়ারেণ্ট বার করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখন সে হাজতে।"

বাইজী কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল

ও বলিল "এতদূর" কিন্তু প্রকাশ্যে হরনাথকে বিশেষ কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "শুনি, তার পর ?"

"থানাতল্লাসী তদন্ত খুব চলছে। গাঁয়ে মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। সেই জন্যই বাবু বললেন যে, যে সমস্ত জিনিস চুরির দাবি দেওয়া গেছে এ সময় সেগুলো স্থানান্তরিত করে রাখা উচিত।"

"তিনি বেশ কথাই বলেছেন।"

"তাই বৌদি, আমি ঠিক করলাম যে অন্য বাহিরের লোকের কাছে এগুলো নিয়ে যাওয়ার চেয়ে, তোমার এখানে লুকিয়ে রাখলে জিনিসগুলো ঘরেই থাকবে অথচ আমাদেরও মকর্দ্দমার খুব সুবিধা হবে। বুঝলে ?"

"হাঁ কতকটা বুঝেছি। তারপর ?"

"তারপর বৌদি, কি মতলব আছে জান ?"

"আবার কি মতলব ?"

"মতলবটা এই যে সেধো ব্যাটার মিয়াদ হয়ে সব দিক ঠাণ্ডাহলে পর এই জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত ক'রে দেওয়া যাবে। বাবুত আর এই লুকান চোরাই মালের জন্য আমাদের কাছ থেকে কোন দাবী করতে পারবেন না। তখন বাবুর অবস্থাও বিশেষ খারাপ হ'য়ে যাবে।

শেষ তোমাতে আমাতে এইগুলো ভাগ করে নেওয়া যাবে কি বল ?"

"তা আর বলছ ঠাকুরপো ! ঠাকুরপো—আমার সোহাগের ঠাকুরপো—কি মতলবই ফেঁদেছ ? এ বুদ্ধি না থাকলে কি জমিদারের ম্যানেজার হওয়া যায় ?"

"যাক শোন ঘুণাক্ষরে কারুকেও জানতে দেবে না যে এসব জিনিস তোমার কাছে আমরা লুকিয়ে রেখেছি।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ ? আমি এতই বোকা ?"

"তা আমি জানি। তাহলে আমি এখন আসি আমার সময় বড় কম।"

"তাহলে বাবু আজ আসছেন না ?"

"আজ কেন—এখন এই ঝঞ্ঝাট না মিটলে এখানে আসতে পারবেন না।"

"বটে ! তা ঠাকুরপো যদি এলে তবে একটু বস জল টল খাও পান খাও। তোমাকে কতদিন পরে আজ কাছে পেলুম এত শীঘ্র কি ছেড়ে দিতে পারি ?" এই বলিয়া বাইজী হরনাথের হাত ধরিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

তখন হরনাথ আবার বলিল—দেখ বাইজী ! তোমার হাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিলাম। এমন কি আমার প্রাণটি অবধি তোমার হাতে। শেষে যেন মজিও না।

অভিমানভরে বাইজী বলিল—বেইমান কি না। সেই যে কথায় আছে "যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।"

"না বৌদি রাগ ক'র না।" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হরনাথ পুনরায় বলিল—একটু কালী কলম ও কাগজ দিতে পার?

তৎক্ষণাৎ টেবিল হইতে কাগজ কলম ও দোয়াত আনিয়া বাইজী হরনাথকে দিল। হরনাথ ষ্টীলট্রাঙ্কটি খুলিয়া রূপার বাসন প্রভৃতির এক একটি করিয়া গণনা করিয়া একটা ফর্দ্দ করিল, তাহার পর তাহা হইতে একটি নকল করিয়া একখানি বাইজীর হস্তে দিল ও একখানি নিজের নিকটে রাখিল এবং বলিয়া দিল যে দুজনের কাছে জিনিসগুলোর তালিকা রহিল। ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

বাইজী ফর্দ্দখানি পাইয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল কিন্তু প্রকাশ্যভাবে একটু অভিমানের ভান করিয়া বলিল— অত কষ্ট না করলেই হ'ত। তোমার জিনিস যেমন দিলে তেমনই থাকবে। তোমার মত না নিয়ে ওতে কি আর আমি হাত দেব?

একটু অপ্রস্তুত হইয়া হরনাথ বলিল—না না সে জন্য বলছি না। খুচরা খুচরা অনেক জিনিস আছে, একটা

ফর্দ্দ থাকা ভাল। আর এই বাক্সের 'ডুপ্লিকেট চাবির' মধ্যে একটা তোমার কাছে থাক আর একটা আমার কাছে থাক, এই বলিয়া একটা চাবি বাইজীকে দিল, আর একটা নিজের রিং-এর মধ্যে রাখিল।

"তা বেশত থাকনা বাধা কি?"

"হাঁ আর এক কথা এই যে, গোলমাল মিটে গেলে বাড়ীর অর্দ্ধেক আমাকে লেখাপড়া করে দিতে হবে।"

"অর্দ্ধেক কেন বলত সবই তোমায় লেখাপড়া ক'রে দেব। যাকে মন প্রাণ জীবন সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়েছি তাকে তুচ্ছ বাড়ীখানি লিখে দেব একি বেশী কথা হ'লো?"

"আচ্ছা আজ আমি চললাম।"

"নিতান্তই যাবে? আচ্ছা আজ কাজ আছে ব'লে যেতে চাচ্ছ আমি তাতে বাধা দেব না। কিন্তু প্রথম সুযোগ পেলেই দেখা দিতে ভুলোনা।"

"না তা আর বলছো।"

"আমি তোমার আশাপথ চেয়ে বসে রইলাম।"

এইরূপ আদর আপ্যায়িত পাইয়া ও ক্ষণেক মান অভিমানের পালা গাহিয়া বাইজী হরনাথকে বিদায় দিল। হরনাথের শকট ফটক ত্যাগ করিয়া ঘ্যার ঘ্যার শব্দে যেই চলিয়া গেল অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও মা!

ওমা! মা! বেটি মরে ঘুমুচ্ছে নাকি? ও মা শীগ্‌গির উপরে আয়।"

মঙ্গলাদাসী এমন উপযুক্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের ডাক শুনিয়া যত তাড়াতাড়ি পারিল উপরে আসিল।

"ও মা ও মা (হি হি হি) ও মা (হি হি হি) ওমা আমি যে আর হাসি চেপে রাখতে পারছি না গো (হি হি)"

মঙ্গলা দাসী প্রথমে ভাবিল বুঝি তাহার কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে। তার পর ভাবিল, মেয়ের বোধ হয় হঠাৎ কোন ব্যারাম হইয়াছে। তাই উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা? অমন করছ কেন মা কি হয়েছে মা?"

"ও মা (হি হি হি) আমি হাসি রাখতে পারছি না। হবে আবার কি? একটা আবার সুবিধে গোছের দাঁও পাওয়া গেছে।"

এই কথা শুনিয়া মঙ্গলাদাসীর মুখে আর হাসি ধরে না। আনন্দে গদগদ হইয়া মঙ্গলাদাসী বলিল—কি হয়েছে বল মা? বেঁচে থাক মা। আর কি বলবো!"

"মা কত জিনিস এসেছে দেখবি?" এই বলিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া একরাশি রৌপ্যনির্ম্মিত বাসন পাত্রাদি বাহির করিয়া বাইজী তাহার মাতাকে দেখাইল।

"হাঁ মা! এগুলো কি বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

"নারে বেটি তা নয়। তবে যখন এগুলো এবাড়ীতে এসে পড়েছে তখন আর সহজে অন্যত্র যাচ্চে না।"

"ব্যাপার যে কি তাত ভাল বুঝতে পারছি না মা।"

"তোর অত বুঝে কাজ নেই। তুই কালই সকালে এবাড়ী থেকে বেরিয়ে তোর নিজের বাড়ীতে চলে যা। তার পর যা করবার আমি করবো।"

মঙ্গলা কন্যার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া মনে মনে তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল ও নিজ কন্যার যাহাতে মঙ্গল হয় সেইরূপ আশীর্ব্বাদসূচক স্তুতি গাহিতে গাহিতে নিজের ঘরে গেল।

মাতাকে বিদায় দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ নিভৃতে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মনে মনে বলিল—উঃ মানুষ এতদূর নীচ ও স্বার্থপর হ'তে পারে? আমরাত বেশ্যা দেহ বিক্রয় ক'রে আমরা অর্থ উপার্জ্জন করি সত্য, আমাদের ব্যবসা অতি নীচ ও হেয়। ম'লে আমাদের নরকেও স্থান হবে না। কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণের ঘরে আমাদের চেয়েও নীচ স্বার্থান্ধ মানুষ বাস করে। হরনাথ ভট্টা-

চার্য্য! হরনাথ ব্রাহ্মণ বংশের কুলাঙ্গার, কুক্কুর! তুই এতদূর স্বার্থপর—এত ঘৃণিত! তুই মনে করেছিস আমি কিছু জানি না। নিজের দুঃখিনী অসহায়া ভ্রাতৃজায়াকে অর্থের লোভে জমিদারের কামবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তার কবলে নিক্ষেপ করবার ষড়যন্ত্রে এত দূর লিপ্ত হয়েছিস? ছি ছি ধিক্ ধিক্! লোকসমাজে তোর মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হয় না? তুই আমার চোখে ধূলি দিবি? তুই আমার কাছথেকে এসব জিনিষের অর্দ্ধেক বখরা নিবি? নিতে পারবি ত? এখন কুটিল বেশ্যাদের চিনতে ও বুঝতে তোর মত লোকের ঢের দেরী। দেখি তোর দৌড় কত। মনে থাকে যেন তোর মরণকাটি আমার হাতে। পশু—নীচ—দানব!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পবিত্র সলিলা ভাগিরথী গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারকে ভাসাইয়া কুল কুল রবে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরান্তে এই হরিদ্বারতীর্থে কুম্ভ মেলা হয়, হিন্দুমাত্রেই এ বিষয় অব-

গত আছেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী এই মেলায় সমবেত হইয়া থাকেন; এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীর একত্র সমাবেশ ও কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়ে যুগপথ ভক্তি ও পুণ্যের ভাব স্বতঃই আসিয়া পড়ে। অতি বড় মহাপাপী পাষণ্ডের প্রাণও ভক্তিরসে গলিয়া যায়। প্রাণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই দৃশ্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ না করিলে ইহার মধুরত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে কেহ সক্ষম হন না। উপস্থিত কুম্ভমেলায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী হরিদ্বারে আসিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামী একজন যোগী ও সিদ্ধপুরুষ। তিনি জঙ্গল পরিপূর্ণ জনতাবিহীন কোলাহল শূন্য হিমালয়ের গহ্বরে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার বয়স অনেকে বলেন প্রায় দু'শ বৎসর। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন যৌবন এখনও বর্ত্তমান। অনেক সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য। এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে তিনি হরিদ্বারে আসিয়াছেন। গঙ্গার তটই ইহাঁর উপস্থিত বসিবার স্থান।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়াছে, স্বামিজীর সম্মুখে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। ভস্মমাখা কৌপীনধারী কৃষ্ণানন্দ এতক্ষণ মহাধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইবার পর

তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য তুলসীদাস কি একটা ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন, তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন—বৎস! আজ তোমাকে এরূপ চিন্তিত দেখিতেছি কেন?"

গুরুর নিকট মিথ্যা বলিতে সাহস হইল না অথচ মনোভাব প্রকাশ করিতে তুলসীদাসের লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এই জন্য তিনি বিশেষ কিছু উত্তর না দিয়া শুধু বলিলেন—আজ্ঞে, আজ্ঞে বিশেষ কিছু নয়। ওটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ নয়।

"না বৎস! তা নয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়-ভাব কখন গোপন থাকিতে পারে না। আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি করিলেই তোমার হৃদয়টি স্বচ্ছ দর্পণের মত দেখিতে পাই।"

"আজ্ঞে আপনি উন্মুক্ত যোগী পুরুষ সুক্ষ্মদৃষ্টিতে আপনি সকলই দেখতে পান।"

"শোন। তুমি এই কয় বৎসর আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ। কতক কতক সাধনাও শিক্ষা করিয়াছ। কিন্তু এখনও বিস্তর বাকি।"

"তা আর বলছেন।"

"এই পথে অধিক অগ্রসর হ'তেগেলে যে প্রাণের

আবশ্যক তোমাতে সেই প্রাণের কতকটা অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। আমি তোমাকে মধ্যে 'একাসন-সিদ্ধি' শিক্ষা দিব বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু যতবার শিক্ষা দিব বলিয়া মনে করিয়া তোমার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি ততবারই স্বচ্ছ দর্পণ রূপ তোমার হৃদয়ের মধ্যে একটা কাল ছায়া দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু এই ৪।৫ দিন হইল সেই ছায়া যেন অধিক গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়া সমস্ত হৃদয়টাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।"

"গুরুদেব! আপনার অনুমান অসত্য নয়। আধুনিক একটি ঘটনায় এ দাসের মন একটু চঞ্চল হ'য়েছে বটে। প্রভু বলুন—আদেশ করুন আমি কি করবো? সংসার ত্যাগ করে সাধন পথে এসে আবার প্রাণে মমতা জেগে উঠে কেন—মায়ার শৃঙ্খল হৃদয়কে জড়ায় কেন? গুরুদেব! গুরুদেব! আপনি রক্ষা না করলে এ জীবনের উদ্ধার নাই।" এই বলিয়া তুলসী দাস গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

তখন স্বামিজি শিষ্য তুলসী দাসের মস্তকে সস্নেহে হস্ত বুলাইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আধুনিক এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছে

যাহাতে তোমার হৃদয়ে চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ?"

"প্রভু! আপনার শিষ্যার পুত্র-হস্তস্থিত সুবর্ণ কবচই যত গণ্ডগোলের মূল।"

"কার? তুমি কন্যা যোগমায়া ভৈরবীর কথা বলিতেছ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"সে বালক তাহার পুত্র নহে। যোগমায়া চিরকুমারী। তিনি আমার উপযুক্ত শিষ্যা তন্ত্র সিদ্ধা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাল, তাহার পুত্রের হস্তস্থিত সুবর্ণ-কবচে তোমার চিত্ত আন্দোলিত হইল কেন?"

"প্রভু! ঐ বালককে ও তাহার হস্তস্থিত কবচ দেখে অবধি মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদয় হচ্চে—এ বালক কে? আর ঐ কবচই বা ঐ বালকের সঙ্গে কিরূপে স্থান পেয়েছে?"

"ঐ কবচে কি বিশেষত্ব আছে?"

"বিশেষত্ব কিছুই নেই। তবে ঐ কবচে একটী এমত চিহ্ন অঙ্কিত আছে সে চিহ্ন সাধারণত অন্য কবচে থাকে না এবং এ দাস বাল্যকালে যে কবচ ব্যবহার করত তাহা ইহারই ঠিক অনুরূপ। মনে হয় ইহা সেই কবচ।"

"ভাল। তাহাই যদি হয় তাহাতে তোমার কি?"

"তাতে এই কৌতূহল প্রাণে সদাই জেগে উঠছে—এ ভৈরবী-পুত্র কে—এ কবচ সে কোথায় পেয়েছে?"

"আমি তোমার কৌতূহল ও প্রশ্নের সার্থকতা কতকটা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, তুমি কন্যা যোগমায়াকে একবার সেই বালকটিকে লইয়া আমার সহিত কাল প্রাতে সাক্ষাৎ করিতে বলিবে।"

"যথা আজ্ঞা প্রভু।"

"তারপর তুমি একবার শেষবার মাতৃভূমিতে যাইয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া তোমার মনের সংশয়, দ্বিধা ও কৌতূহল যাহা কিছু প্রাণে আছে তাহা নিবারণ পূর্ব্বক ও মাতৃ ভূমির নিকট শেষ বিদায় লইয়া আমার সহিত মঠে সাক্ষাৎ করিবে। এরূপ না করিলে চিত্তের দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে এবং পরিশেষে ঐ আকাঙ্খাই তোমার সাধন-পথের বিশেষ অন্তরায় উৎপন্ন করিবে।"

"তথাস্তু। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।"

"যাও বৎস। আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে। নিজ আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করগে।"

এই কথা শেষ হইবার পর তুলসী দাস গুরুদেবের চরণধূলি লইয়া বিদায় লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জজ বাহাদুর সাধুর বিপদের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি সাধুকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে পনর দিনের ছুটি লইয়া নিজের পল্লীতে আসিয়াছেন। আসিয়াই প্রথম দুঃসংবাদ শুনিলেন যে গত সন্ধ্যার সময় লাবণ্য তাঁহাদের পুকুরে গা ধুইতে বহির্গত হইয়াছে ইহা চাঁপা দেখিয়াছে কিন্তু তাহার পর তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। ইহা শুনিয়া জজবাবু বিপদের উপর বিপদ গণিলেন। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর রাজ কর্ম্মচারী। তাঁহার আবেদন ও আদেশ মত পুলিস ও পুলিসের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে নিযুক্ত হইল। কিন্তু উপস্থিত তিনি লাবণ্যের অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কারণ আজ সাধুর বিচারের দিন। সাধু যে নিরপরাধী ও শত্রু পক্ষের চক্রে পড়িয়া বিপদ জালে পতিত হইয়াছে ইহা তাঁহার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই কারণে বিশেষ যাহাতে সাধুর নিরপরাধীতা বিচারপতির নিকট প্রতিপন্ন হয় এই তাঁহার চেষ্টা। তিনি এই মকর্দ্দমায় কলিকাতা হইতে আইনজ্ঞ ভাল ভাল উকিল ও কাউনসেল

নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজে আইনজ্ঞ সূক্ষ্মদৃষ্টি বিচারপতি। তিনি উকিল কাউনসিলদের সহিত গবেষণার সহিত যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন ও যাহাতে জগত সমক্ষে তাঁহার সাধুর সাধুত্ব প্রতীয়মান হয় সেই বিষয়ের চেষ্টার কোন ক্রুটি করিতেছেন না। অজস্র ধারে তিনি অর্থব্যয় করিতেছেন। আজ বিচারালয়ে লোকে লোকারণ্য। বিচারপতি বিচারাসনে বসিবার পরই সাধুর মদর্দ্দমার ডাক হইল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে আদালতে উপস্থিত হন নাই। তাঁহার ম্যানেজার, আমলাবর্গ সকলেই উপস্থিত তা ছাড়া তাঁহার অনুগত অনেকগুলি লোক জমিদার বাবুর পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। হরনাথ এই মামলায় প্রথম সাক্ষী। সে কি, কি জিনিস চুরি গিয়াছে তাহার তালিকা দিল। জিনিস গুলি কোথায় কি ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল ও কি ভাবে তাহা চুরি গিয়াছে, সে কখন সংবাদ পাইল, পাইয়া কি করিল প্রভৃতি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল।

বিপিন নেউগি ও তিনকড়ি মণ্ডল চুরি হইবার পরই যখন চোবেজী ও পাঁড়ে "চোরি হায়" "চোর ভাগল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তখন তাহারা বাবুর বৈঠকখানা ঘর হইতে বহির্গত হইয়া সাধুকে ও তাহার আর

একজন সঙ্গীকে বাসনের মোট লইয়া দৌড়িতে দেখিয়াছে এইরূপ সাক্ষী দিল। চোবেজী ও পাঁড়ে চোরের পিছনে লাঠি লইয়া দৌড়িয়াছিল কিন্তু কিছুতেই চোরকে ধরিতে বা জখম করিতে সক্ষম হইল না। অগত্যা তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। বিচারপতি তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ও তাহাদের বিশেষ স্তুতি গাহিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন—বিচারপতি নাকি ইঁহাদের বীরত্ব কাহিনী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া যাহাতে ইহারা উপযুক্ত পুরস্কার পায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

তারপর পেলারাম ও বিশু তাঁতি নাকি চুরি হইবার পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে গিয়া সাধুর জমির সীমানায় দুই তিনটা অপহৃত বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া আসে। পরে এই ভক্ত প্রজাদ্বয় জমিদার বাবুর নিকট তাহা আনয়ন করে। শেষে জমিদার বাবুর আদেশ মত সেগুলি পুলিসের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি সাক্ষীর এজাহার হইল। সাধুর বিরুদ্ধে অপরাধ এক রকম প্রমাণ হইয়া গেল। সাধুর পক্ষে উকিল কাউনসিল সাক্ষীদের এজাহারে বিশেষ কিছু গোলযোগ বা অসামঞ্জস্য দেখাইতে পারিলেন

না। কারণ সমস্ত সাক্ষীগুলিই আজ ছয় সাত দিন ধরিয়া উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়াই এজাহার দিতে আসিয়াছে।

জজবাবু নিজেই বিচারপতির কার্য্য করেন। সাক্ষীর প্রমাণের বল দেখিয়া মনে মনে বিচলিত হইলেন। অবশ্য মুখে সাধুকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাক্ষীদের এজাহার শেষ হইবার পর উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইল। বিচারপতি রায় লিখিতে বসিলেন। তাহার ঠিক পূর্ব্বেই একবার জজবাবুর মুখের দিকে একটু ম্লান ও সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ এই যে ফরিয়াদী পক্ষের মকর্দ্দমা এক রকম প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। জজবাবু আসামীর পক্ষে থাকিলেও তিনি আইনে বাধ্য—কি করিবেন। অতএব অপরাধীর দণ্ড হয় এইরূপ রায়ই তিনি দিবেন।

জজবাবু সব বুঝিলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। উভয় পক্ষের লোক সকলেই উদ্‌গ্রীব চিত্তে রায় শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এমন সময় গম্‌গম্‌ করিয়া এক জুড়ি আসিয়া আদালত-সম্মুখে থামিল। অনতিবিলম্বে একটি অপূর্ব্ব

সুন্দরী যুবতী মুল্যবান অলঙ্কার ও বসন ভূষণে আচ্ছাদিত হইয়া একেবারে বিনাবাক্য ব্যয়ে আসিয়া সাক্ষীর কাটগড়া অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী আদালত গৃহে প্রবেশ মাত্র গৃহটি এসেন্সের সৌরভে ও সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। সকলেই এমন কি বিচারপতি অবধি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ রমণী কে? শুধু শিহরিয়া উঠিল হরনাথ ও তাহার অনুচর জমিদারের কর্ম্মচারিগণ।

সুন্দরী আসিয়াই বিচারপতিকে উদ্দেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল—

হুজুর! অধিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি আদালত গৃহে এইভাবে প্রবেশ করে অপরাধ করেছি কি আইন সঙ্গত কার্য্য করেছি তাহা আমি জানি না। অপরাধ করে থাকি তবে দণ্ড দিবেন, আমি মাথা পেতে লব।"

বিচারপতি—আপনি কে? এরূপ ভাবে আদালতের কার্য্যে বাধা দিলে নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় হবেন।

"তা হই হব। কিন্তু আমাকে দণ্ড দিবার পূর্ব্বে এ দাসীর আবেদনটি আপনাকে শুনতে হবে। আজ একজন নিরীহ নিরপরাধীকে দুষ্ট লোকে চক্রান্ত করে আইনের দোহাই দিয়া দণ্ড দিবার উদ্যোগ করেছে;

তাই তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য হুজুর আদালতে এসেছি।"

"আপনি আদালতের সহিত বিদ্রূপ করতে এসেছেন? ইহাতে আদালতের অপমান করা হয়। আদালতের অপমান করলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হতে হয়—তাহা কি আপনি জানেন না?"

"হুজুর! বিদ্রূপ করতে আসব কেন? আসামী সাধুর সাধুত্বের প্রমাণ নিয়ে এসেছি। যদি তাতে অপরাধ হ'য়ে থাকে তবে দণ্ড দিবেন।"

"কি প্রমাণ এনেছ আমি দেখতে চাই?"

এই আশ্বাস বচন শুনিয়া সুন্দরী নিজের কটিদেশ হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিল। কাগজ বাহির করিবা মাত্র ফরিয়াদী তরফের প্রধান সাক্ষী ম্যানেজার হরনাথ ভট্টাচার্য্যের বদন শুকাইয়া গেল ও সে আদালত গৃহত্যাগ করিবার জন্য আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া সুন্দরী বিচারপতির দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—

হুজুর! প্রমাণের কথা শুনে জমিদার বাবুর প্রধান সাক্ষী পলায়নোদ্যত হচ্ছেন কেন? ওকে দিয়েই আমার বাক্য প্রমাণ হইবে।

বিচারপতি একবার ভাবিলেন বোধ হয় এই রমণী বিকৃত মস্তিষ্ক। কিন্তু সুন্দরী যেরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে ও আদালতের সম্মান মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া উত্তর করিতেছে তাহা দেখিয়া তিনি এই ধারণা-মত কার্য্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কোর্টইনস্‌-পেকটারকে আদেশ দিলেন যেন সাক্ষীদের মধ্যে কেহ আদালত গৃহ পরিত্যাগ না করে। কাজেই ইনস্‌পেকটার একটু অধিক কড়া হুকুমে সাক্ষীদের যথা স্থানে বসাইয়া দিলেন। সকলেই এই সব দেখিয়া শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর "আপনার কি প্রমাণ আছে?" বলিয়া বিচারপতি রমণীকে প্রশ্ন করিলেন।

"এই তালিকাখানি দেখবেন কি?" সুন্দরী সেই কাগজখানি বিচারপতির হস্তে দিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন—

এই ফর্দ্দে অপহৃত মালের তালিকা আছে দেখছি। এতে কি প্রমাণ হবে?

"হুজুর! একটু অপেক্ষা করুন। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইহার লেখক কে জানেন?"

"না। কে?"

"ঐ জমিদার বাবুর মানেজার—হরনাথ ভট্টাচার্য্য। উনি নিজে জমিদার বাবুর জিনিষগুলি গোপনে আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে আসেন এবং দুইখানি তালিকা করে একখানি আমার নিকট ও অপরখানি নিজের নিকট রেখে দেন।"

"ইহার অর্থ কি?" এই প্রশ্ন করিয়া বিচারপতি বিস্ময়াবনত নেত্রে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং হস্তস্থিত কলমটি দোয়াত দানের উপর রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সমস্ত শুনিতে লাগিলেন।

"উদ্দেশ্য সাধুকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া জেলে পাঠান। সাধুকে জেলে না দিলে তিনি তাঁর ভ্রাতৃজায়া সাধ্বী লাবণ্যদেবীকে জমিদার বাবুর কর-কবলিত করতে পারেন না।"

"তবে কি রৌপ্য সামগ্রী গুলি চুরি হয় নি?"

"জমিদার বাবুর বাড়ী হতে তাঁরই আদেশে ম্যানেজার বাবু কর্ত্তৃক তাঁর বিলাসিনী রক্ষিতা রমণী এই অধিনীর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হ'য়েছে মাত্র। এতে যদি আইনে চুরি হয়ে থাকে তবে সে চোর হরনাথ ভট্টাচায্য—সাধু নহে।"

"এ কি আপনি সত্য বলছেন? মানুষ এতদূর নীচ হতে পারে? অপহৃত বাসন গুলি কোথায়?"

রমণী কাটগড়া হইতে ইঙ্গিত করিবামাত্র একজন খোট্টা চাকর আদালত গৃহের দ্বার দেশ হইতে একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক আনিয়া আদালত সমক্ষে হাজির করিল।

বিচারপতি তখন বলিলেন—ইহার মধ্যে কি আছে দেখতে চাই। ইহার চাবী কোথায়?

"ম্যানেজার বাবুর নিকট তাঁর চাবির রিংএ অন্য চাবির সহিত আছে।"

ইহা শুনিয়া কুপিত সিংহের ন্যায় বিচারপতি মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া হরনাথকে লক্ষ্য করিয়া ইনস্‌পেক্টারের উপর তাহাকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলেন। হরনাথ তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাকিমের সম্মুখে হাজির করা হইল। পরীক্ষায় রমণীর কথাগুলি সপ্রমাণিত হইল। তাহার পকেটে যে চাবির রিংছিল তাহাতে ঐ ট্রাঙ্কের চাবি পাওয়া গেল। তখনি আদালত সমক্ষে ঐ ট্রাঙ্কটি খোলা হইল। খুলিবামাত্র ফর্দ্দের সহিত সমস্ত জিনিষ গুলি মিলিয়া গেল এবং হরনাথ এজাহারে যে জিনিষের তালিকা দিয়াছিল তাহা এই ফর্দ্দের অবিকল অনুরূপ প্রমাণ হইয়া গেল। এই সব দেখিয়া বিচারপতি রোষে কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি তখন হরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রমণী প্রদত্ত ফর্দ্দখানি

তাহার হাতের লেখা কিনা। উত্তর দিতে প্রথম হরনাথ একটু ইতঃস্তত করাতে তিনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন —সত্য উত্তর না দিলে তাহাকে তিনি বিশেষরূপে দণ্ড দিবেন। হরনাথ কি উত্তর দিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি নিজের হস্তাক্ষর অস্বীকার করিতে সাহসী হইল না।

জজ বাবু ও তাঁহার পক্ষের লোকেরা আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হৃদয়ের আবেগ থামাইতে পারিলেন না। অচিরে আদালত গৃহে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গেল। বিচারপতি এই সব দেখিয়া ক্ষণেক নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলেই সুন্দরীর ভূরী ভূরী প্রশংসা করিতে লাগিল। বিচারপতি তৎক্ষণাৎ সাধুকে বে-কসুর খালাস দিয়া জমিদার তরফের সকল সাক্ষি গুলিকে গ্রেপ্তার করাইলেন এবং জমিদার দেবেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিয়া রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আদালত বন্ধ করিলেন। তিনি আসন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সেই অনিন্দ্য-সুন্দরীকে আপ্যায়িত করিতে ভুলিলেন না। বিদায়ের পূর্ব্বে বলিলেন—

"আপনি আদালতকে বিশেষ সাহায্য করে বিচার বিভ্রাট ঘটিতে দেন নাই এ জন্য আদালত আপনার নিকট

কৃতজ্ঞ। আপনি প্রশংসা ও পুরস্কার পাইবার যোগ্য—পাত্রী। আপনাকে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ দিচ্চি।"

রমণী অভিবাদন পূর্ব্বক আদালত গৃহ ত্যাগ করিল ও নিজের জুড়ী চড়িয়া নিমিষের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল।

জজ বাবুর আজ আনন্দ ধরে না। সাধুকে নিকটে পাইয়া তাহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া আবেগভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তিনি আদালত পরিত্যাগ করিবেন এমন সময় একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহার কাণে কি বলিল। কথা শুনিয়া জজ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"

"ঠিক দেখেছেন? ভুল হয় নি ত?"

"না ম'শাই। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যকে আর আমি চিনি না? "এতক্ষণ বোধ হয় আমার নিম্নতন কর্ম্মচারীরা তাঁকে উদ্ধার করেছে।"

"তবে আর বিলম্ব নয়। এখনি সর্ব্বাগ্রে সেই থানেই চলুন।" সাধু নিজের এত কষ্ট ও লাঞ্ছনা একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। হৃষীকেশের সংবাদ পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিল। বলিল "বাবা! চল চল আগে বাবা

ঠাকুরের সন্ধান নিই গে চল। তারপর মা জননীর খবর নিতে হবে। বাবা! ধর্ম্ম আছেন—ধর্ম্ম আছেন—এখনও চন্দর স্থয্যি উঠছে, দিন রাত হচ্ছে।” ইহাঁরা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া একেবারে সেই পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত আদালত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আকাশ পরিচ্ছন্ন। সান্ধ্য গগনে চাঁদ উঠিয়াছে। ফুর ফুরে দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। কৃষ্ণপুরের উত্তর প্রান্তস্থিত সদর রাস্তার উপরই জমিদার বাবুর বাগান বাটী; বাগানটি অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। বাগানের এক্ দিকে সদর রাস্তা অপর দিক দিয়া ক্ষুদ্র তটিনী রেবতী প্রবাহিত হইতেছে। বাগান-মধ্যস্থিত উচ্চ সৌধরাশি রজনীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোক প্রতিভাসিত হইয়া উজ্জ্বল—কনক-কান্তি ধারণ করিয়াছে। বাগানটী জুঁই বেল মতিয়া ও চম্পকের সৌরভে আমোদিত। রাত্রি প্রায় ১০টা, নিস্তব্ধ জগৎ। চারিদিকে যেন একটা শান্তির ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগান বাটী জনশূন্য শুধু

পুণ্য-প্রতিমা

পুষ্করিণীর সোপান-বেদীর উপর একটি সুন্দরী হস্তোপরি কপোল ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে বসিয়া উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন এবং তাঁহার গণ্ড বহিয়া মধ্যে মধ্যে অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছে। কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন এমন সময় ফটকের নিকট একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ীর শব্দে রমণী শিহরিয়া উঠিলেন। গাড়ী থামিবা মাত্র একটি বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। দুইজন দ্বারবান অমনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বাবুকে সেলাম দিয়া ফটকের চাবি খুলিয়া বাবুকে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। বাবু প্রবেশ করিবার মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বিবিকো হুঁয়াসে লে আয়া হ্যায় ?"

"হাঁ হুজুর। বিবি বগিচামে ঘুমতা হ্যায় ?

"বিবিকো খুব খবর দারীমে রাখ্যা হ্যায়।"

"বহুত আচ্ছা। খুব খবরদারী রহো। কিসিকো বাগিচামে মত ঘুসনে দেও।"

"যো হুকুম, খোদাবন্দ।"

বাবু আর বিলম্ব না করিয়া বাগানের মধ্যে দ্রুতপদে

চলিয়া গেলেন। কতকটা অগ্রসর হইয়া রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তখন অতি ধীর ভাবে রমণীর নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। কিন্তু পাছে আগন্তুক অধিক নিকটবর্ত্তী হয় এই ভয়ে রমণী নিকটস্থ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কপাট অর্গল বদ্ধ করিবেন বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন। কিন্তু তিনি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে বাবু দ্রুতপদে যাইয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই নিজেই অর্গল আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

গৃহটি কার্পেটে মোড়া। কৌচ, সোফা, চেয়ার, টেবিল দেওয়ালগিরি ঝাড় ও দর্পণে উহা শোভিত। গৃহের এক পার্শ্বে পিয়ানো, এক পার্শ্বে টেবিল হারমোনিয়ম ও বাদ্য যন্ত্রাদি রহিয়াছে। প্রাচীর গাত্রে উলঙ্গিনী রমণীদের চিত্র ও ফটোগ্রাফ গৃহ স্বামীর সুরুচির বিস্তর প্রমাণ দিতেছে। ইহা জমিদার দেবেন্দ্র নাথের বিলাস ভবন। আজ তাঁহার আদেশ মত সমস্ত ঝাড় দেওয়ালগিরি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। উজ্জ্বল দীপালোকে রমণীর সৌন্দর্য্য সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ কপাট বন্ধ করিয়া একখানি কুসন চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। এতক্ষণে যেন তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। বোধ হয় মনে মনে ভাবিলেন যে তাঁহার এত দিনের সঞ্চিত আশা অচিরে পূর্ণ হইবে। নীরবে একটি ড্রয়ার খুলিয়া একটি বোতল খুলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি পেগ্ গলাধঃকরণ করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী গৃহের এক কোণে দাঁড়াইয়া অজস্র ধারে কাঁদিতেছেন ও মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতেছেন।

ক্ষণেক পরে গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—লাবণ্য! তুমি কাঁদছ কেন?

রমণী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

"শুন লাবণ্য! কেঁদোনা। আমি যেদিন তোমায় দেখেছি সেই দিন হতে পাগল হয়েছি। তোমার দুঃখ কষ্ট দেখে আমার প্রাণ কাঁদে। তোমাকে সাহায্য করবো ব'লে কতবার প্রস্তাব ক'রে লোক পাঠালাম কিন্তু তুমি সে সাহায্য গ্রহণ করনি।"

রমণী তথাপি নীরব।

"দেখো লাবণ্য—আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না। যদি সহজে তোমায় করায়ত্ব করতে না পারি তাহলে

এই নিভৃত কক্ষে বল প্রয়োগ পূর্ব্বক তোমাকে অধিকার করবো।"

রমণী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি অল্প ক্ষণের মধ্যে স্থির করিলেন যে এই অসহায় অবস্থায় উন্মত্তকামুকের সহিত বাক বিতণ্ডায় যতটা সময় কাটাইতে পারেন ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল। কারণ এইরূপ ভাবে নীরব থাকিলে অচিরে পশুর হস্তে তিনি নিগৃহিত হইবেন। তাই সরমের মাথা খাইয়া তখন তিনি উত্তর করিলেন—

"আমার কি অপরাধ? আপনি একজন আমার মত অসহায় দুঃখিনীর প্রতি কি দোষে এত নির্য্যাতন করছেন?"

"অপরাধ! তোমার সহস্র অপরাধ! অত রূপ নিয়া তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলে কেন? তুমি দুঃখিনী?"

"আমি অতি অভাগিনী—আমায় ক্ষমা করুন। আমায় পিঞ্জরে পুরে তাড়না করবেন না। আমি আপনার দীন প্রজা—আপনার কন্যা।"

"ও সব কথা ত্যাগ কর। তুমি অভাগিনী?" এই বলিয়া আবার বোতল হইতে কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া দেবেন্দ্রনাথ পান করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"রাজার রাণী তুমি—রাজার উপভোগ্যা তুমি। রাজার মত ঐশ্বর্য্য দিব—প্রাণভরা ভালবাসা দিব। তুমি আমার—তোমার কিসের দুঃখ ?"

"আপনি আমায় ছেড়ে দিন। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

হাসিয়া দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—

"বল কি ? তোমায় এত সহজে ছেড়ে দিব ? তোমায় ছেড়ে দিব ব'লে এত ষড়যন্ত্র করে তোমায় ধরেছি ? এখন খাঁচায় পুরেছি যেমন ইচ্ছা বুলি শেখাব। বুঝলে ধনমণি ?"

"আমায় ছেড়ে দিন। অমন কথা মুখে আনবেন না। আমায় ছেড়ে দিন।"

"এইখানে আজ আত্মহত্যা ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব কিন্তু তোমায় ছাড়ব না। তুমি একটা নিরন্ন পাগল ব্রাহ্মণের জন্য পাগলিনী হয়ে বেড়াচ্ছ, আর আমি জমিদার দেবেন্দ্রনাথ রায় তোমার এতটুকু অনুগ্রহ পাবার জন্য—এতটুকু কৃপা কণা পাবার জন্য উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি ? অনেক কৌশলে তোমায় ধরেছি। তোমাকে এত সহজে ছাড়বো না।"

"আপনি জমিদার—প্রজার রক্ষক—দীনের প্রতি-

পালক। ভগবান আপনাকে অর্থ দিয়েছেন। আর্ত্তের দুঃখ ঘোচান—দরিদ্রের অশ্রুজল মোচান—নিরন্নকে অন্ন দিন। জগদীশ্বর সন্তুষ্ট হবেন—পূর্ব্বপুরুষেরা পুলকে নৃত্য করবেন—দেবতারা স্বর্গ হতে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করবেন। অর্থের অমর্য্যাদা করবেন না—সতীর অসম্মান করবেন না। রমণীর রূপ কয়দিন? মাটির দেহ একদিন ত মাটি হয়ে যাবে। এ রূপের জন্য মহাপাপ সঞ্চয় করবেন না। আমায় ছেড়ে দিন।"

ক্রমে মদিরার নেশা দেবেন্দ্রনাথকে অধিকার করিতেছিল। তিনি ঐ সব কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"ও সব বাজে 'লেকচার' ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি চাঁদ বদন! এখন ও সব ছেড়ে দু একটা নূতন বুলি আওড়াও—কাজের কথা বল। বল—সেই হতভাগা পাগলটাকে ছেড়ে আমার হবে কি না?"

"আমার স্বামীর নিন্দা করবেন না। আপনার কাছে তিনি পাগল হতে পারেন—তিনি দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন তিনি আমার স্বামী—তিনি আমার গুরু—আমার ইষ্টদেব।"

"কোথায় তোমার ইষ্টদেব? তাকে অনেক দিন

সরিয়েছি। এমন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি যে সন্ধান পাবার কোন উপায় নেই। বেশী যদি বাড়াবাড়ি কর—যদি আমার মতে কাজ না কর তাহ'লে কি করবো জান? তোমার সেই ইষ্টদেবকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। আমার নাম দেবেন্দ্র নাথ রায়।" এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ আর এক গ্লাস সবেগে টানিয়া লইলেন ও উন্মত্তের মত লাবণ্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

লাবণ্য এই কথাগুলি শুনিয়া আবার শিহরিয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যাধ-বিতাড়িতা হরিণীর ন্যায় আক্রমণকারীর কালগ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রাণভয়ে গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ঘুরিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সহজে তাঁহাকে আয়ত্ব করিতে না পারিয়া কুপিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—

"শোন লাবণ্য—শোন। ভাল চাও ত এখনও শোন। নচেৎ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক তোমাকে গ্রহণ করবো।" এই বলিয়া কুপিত শার্দ্দুলের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া লাবণ্যের অঞ্চলের এক প্রান্ত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন এবং উন্মত্তের মত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিলেন। লাবণ্য নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে

কোথায় আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর। কোথা মা শঙ্করি! কোথা মা সতীরাণি! দুর্বৃত্ত দস্যুর হাতে আজ অবলার সর্ব্বস্ব যায়। কে আছ? সহায় হও।

দেবেন্দ্রনাথ এই চীৎকার শুনিয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির রোল তুলিলেন। বলিলেন—"এখানে আর কেউ নেই বাবা—এক আছে দেবেন্দ্র নাথ আর আছে লাবণ্য।" এই বলিয়া জোরে লাবণ্যকে টানিয়া নিজের হৃদয় মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিলেন। আবার ভীম রবে সাধ্বী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে আছ শীঘ্র এস। রক্ষা কর! রক্ষা কর! পাষণ্ডের হাতে আজ সতীর সতীত্ব যায়। মা মা শঙ্করি! মা জননি! অনাথিনী কন্যা তোমার বড় বিপদে আজ আত্মহারা হয়ে তোমায় ডাকছে। মা মা রক্ষা কর!"

"মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! ভয় নাই। ভয় নাই।"

বাহিরে গৃহপার্শ্ব হইতে জলদগম্ভীর স্বরে এই শব্দ গৃহমধ্যে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। যেন প্রলয়ের হুঙ্কার বহিয়া গেল। সমস্ত অট্টালিকা যেন ভূকম্পে কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে অট্টহাসির রোল জাগিয়া উঠিল। ভয়বিহ্বল চিত্তে দেবেন্দ্রনাথ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

পাষণ্ডের দৃঢ়-বজ্রমুষ্টিমধ্যস্থিত লাবণ্যের হস্ত স্খলিত হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে গৃহস্থিত অর্গল সবেগে খুলিয়া গেল। পলকমধ্যে সম্মুখে এক ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী মূর্ত্তি ভীমা প্রচণ্ডা চণ্ডিকারূপে আসিয়া ক্রোধ-কটাক্ষে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া বহ্নি-কণা ছুটিতেছে, যেন পামরকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে চায়। ভৈরবীর কপালে দীর্ঘ সিন্দূরের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে গৈরিক বসন, হস্তে ত্রিশূল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সন্ন্যাসিনী প্রথমেই দেবেন্দ্র-নাথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া করিয়া উঠিলেন—

"রহ স্থির। নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ—জড়—পাষাণের মত রহ স্থির।" পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে কহিলেন—

"মা মা! মহাশক্তি! শক্তি দাও কিঙ্করীরে।"

এই বাক্যকয়টি উচ্চারিত হইবামাত্র উদ্দাম কামোন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত দেবেন্দ্রনাথ বাকশক্তিহীন নিশ্চল প্রস্তর-খণ্ডের মত স্থির নেত্রে অচেতন প্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। লাবণ্য "মা—মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এইবার ভৈরবীর দৃষ্টি লাবণ্যের উপর;

পড়িল। সবেগে লাবণ্যের নিকট গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

"ভয় কি মা! ভয় কি মা! সাধ্বী সতীরাণি! তোর কাতর ক্রন্দনে যে মার সিংহাসন টলে যায়। তোর আর্ত্তনাদে যে মায়ের বুকে ব্যথা লাগে মা। তোর কিসের ভাবনা? তোর অঙ্গ স্পর্শ করে কে রে? উঠ মা— উঠ মা!"

এই সময়ে আর একজন সন্ন্যাসী ও বালক আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও একেবারে ভৈরবীর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—

"ভগ্নি যোগমায়া! তুমি পথে যাহা অনুমান করেছিলে তাহা এখন সত্য দেখছি।"—এই বলিয়া কতক অগ্রসর হইয়া লাবণ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূমিতলে পতিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"এ কি? এ কি? এ কি দেখছি?

ভৈরবী যোগমায়া উত্তরে বলিলেন—

কেন তুলসীদাস? কি দেখছ? অমন শিহরিয়া উঠলে কেন?

এই সময় বালক ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিল—

মা! কি হয়েছে মা? কখন বাড়ী যাবি মা? ও শুয়ে কে মা?

যোগমায়া—এ আমার মেয়ে, বাবা।

বালক—ও বাবা! তোর অত বড় মেয়ে—অত বড় মেয়ে। দূর, মিছে কথা। ও বাবা! অত বড় মেয়ে? —এই বলিয়া বালক হাসিয়া আকুল।

যোগমায়া—হাঁরে দুষ্ট ছেলে—এ আমার মেয়ে।

বালক—দেখি—তোর মেযে দেখি। বলিয়া লাবণ্যের মুখের নিকট মুখ লইয়া বালক যোগমায়ার এই নূতন মেয়েকে দেখিতে লাগিল। বালক মুখ নীচু করিয়া লাবণ্যকে দেখিতেছে, এমন সময় পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, জজবাবু, পাগল হৃষীকেশ, সাধু পাহারাওয়ালা প্রভৃতি সদলে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনাবলী দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে বালকের পৃষ্ঠদেশ প্রতি হৃষীকেশের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, কারণ তখন বালক প্রবেশের দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া নিজের পৃষ্ঠ নোওয়াইয়া লাবণ্যকে দেখিতে-ছিল। বালককে দেখিয়াই পাগল হৃষীকেশ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"এ কি? কি দেখছি? কার চিত্র নেত্রসম্মুখে? কে

আছ—কে জান? এ সংশয় দূর কর! আমি হৃদয়-আবেগ থামাতে পারছি না। আমার হৃদয় কাঁপছে। আমায় রক্ষা কর। পৃষ্ঠে ত্রিশূল-চিহ্নধারী এ বালক কে? এতদিন পরে একে কোথায় পেলে? সীতানাথ! সীতানাথ! আমার সীতানাথ!" বলিয়া হৃষীকেশ উন্মত্তের মত বালকের পার্শ্বে যাইলেন। কিন্তু তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল। তিনি প্রায় সংজ্ঞাচ্যুত হইয়া বালকের নিকট বসিয়া পড়িলেন। এক ঘটনার উপর আবার এই নূতন ঘটনা দেখিয়া ভৈরবী একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তুলসীদাস এই সব দেখিয়া ক্ষণেক কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তিনি যেন ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন। ক্ষণপরেই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন—

"যোগমায়া! এ কি মায়ার সৃজন করলে? হৃষীকেশ! হৃষীকেশ! এ বৃদ্ধকে চিনতে পার?"

হৃষীকেশ—বাবা, বাবা! এত দিন পরে দাসকে মনে পড়েছে? কত ঝঞ্ঝাবাত কত ঝড় অভাগার শিরের উপর দিয়ে চলে গেল। দয়াময় পিতৃদেব! এ দাসকে কি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন?

তুলসী—ভুলিনি বৎস! সংসার ত্যাগ ক'রে গুরুর

নিকট শিক্ষার জন্য এতদিন গুরুগৃহে বাস করলাম। তোদের ভুলতে পারিনি ব'লেই গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আবার জন্মভূমিতে এসেছি। যা হোক, সে সব কথা পরে বলবো। উপস্থিত এ বালককে দেখে চীৎকার করে উঠলে কেন? সীতানাথ কে?

হৃষীকেশ—প্রভু! পিতৃদেব! আগে বলুন এ বালককে কোথায় পেলেন? আমি মন স্থির করতে পারছি না। আমি এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

তুলসী—এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তবে এই বালকের হাতের এই কবচটি দেখে অবধি মনে বড়ই সংশয় ওঠে ও মনের চাঞ্চল্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই বালকেরই সবিশেষ সংবাদ জানবার জন্যই অভাগা স্বর্গাদপি গরিয়ান্ গুরুগৃহ ত্যাগ করে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে।"

কবচ দেখিয়া হৃষীকেশ পুনরপি বলিলেন—

বাবা! বাবা! বলুন এ বালককে কোথায় পেলেন? আমার ধৈর্য্য সয় না—এক-একটি মুহূর্ত্ত সহস্র বৎসর অপেক্ষা দীর্ঘ ব'লে মনে হচ্ছে। বলুন—বলুন এ বালককে কোথায় পেলেন?

তুলসী—বাবা! এ বিষয়ে ভগ্নী যোগমায়া সমস্তই

জানেন। এ বালক তাঁহারই নিকট মাতৃস্নেহ পেয়ে জীবনধারণ করে আসছিল—এইমাত্র জানি।”

যোগমায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে হৃষীকেশ কহিলেন—মা! মা! কিঙ্করের প্রতি করুণা করে বলুন,এ বালককে কোথায় পেলেন?

যোগমায়া মনে ভাবিলেন যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে তিনি আসিয়াছেন, কিছু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। অগত্যা হৃষীকেশের অনুনয় ও কাতরতায় তিনি বলিলেন—

“বাবা! দামোদর নদের উপর নবগ্রামে ভদ্রকালীর মন্দির আছে। আমি আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃস্নাত হয়ে তটে উঠবো মনে করছি, এমন সময় এক কদলীবৃক্ষ নির্ম্মিত ভেলায় এই সর্পদংষ্ট্র বালককে পাই। তাহারপর পরমা চণ্ডিকার কৃপায়, উপযুক্ত ঔষধ ও সেবায় বালককে আরোগ্য করে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করে আসছি। এই বালকই এখন আমার যোগমার্গে একটি অন্তরায় হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিশু আমার পাষাণপ্রাণকে মায়ায় দ্রবীভূত ক’রে ফেলেছে।”

কথা শুনিয়া হৃষীকেশ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—মা! মা! দয়াময়ী! আমার

সীতানাথ তোমার করুণায় বেঁচে আছে? এতদিনের দীর্ঘ জ্বালা আজ একটি কথায় নিবিয়ে দিলে মা! মা শঙ্করি! দয়াময়ী—কে বলে তুমি পাষাণী?

তার পর লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষীকেশ চমকিত হইয়া বলিলেন—

এ কে! লাবণ্য? লাবণ্য এই পাপ-পুরীতে কেন?

জজবাবু তখন উত্তরে বলিলেন—তার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে—আমি পরে বলব।

এই সময় লাবণ্যের চেতনা-সঞ্চার হইতেছিল। লাবণ্য একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শুধু বলিলেন—

আমি কোথায়? তোমরা কে?

হৃষীকেশ স্ত্রীর চেতনা সম্পাদন হইয়াছে দেখিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"লাবণ্য! লাবণ্য! উঠ—উঠ—একবার চেয়ে দেখ জনার্দ্দন দেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। মা শঙ্করী তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ। আর আমি পাগল নই। আমার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচে গেছে। আমার সীতানাথকে ফিরে পেয়েছি—আমার নয়নমণি আবার ফিরে এসেছে, বাবা এসেছেন। এই দেখ—চেয়ে দেখ। তোমার সীতানাথকে কোলে

তুলে নাও।" এই বলিয়া বালক সীতানাথকে হৃষীকেশ লাবণ্যার ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন।

তখন জজ বাবু বলিলেন—

মা! দেখ—চেয়ে দেখ—তোমার পুত্র বৎসল সন্তান সাধু, বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণ হ'য়ে বে-কসুর খালাস পেয়েছে —আজ তোমার পদধূলি নিতে এসেছে।

লাবণ্য চক্ষু চাহিয়া সমস্ত দেখিলেন। সীতানাথকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। "বাবা সীতানাথ! বাবা সীতানাথ!" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তারপর বলিলেন—

"এ কি সত্য না একটা স্বপ্ন দেখ্ছি?"

তখন হৃষীকেশ বলিলেন—

"বাবার পদধূলি লও।"

লাবণ্য উঠিয়া বসিয়া তুলসীদাসের পদধূলি শিরে লইয়া বলিলেন—

"এ কি? কি দেখ্ছি? না, না এ একটা স্বপ্ন—এ সত্য নয়। ও গো! এ স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে দিও না। ঘুম ঘোর নষ্ট ক'রে দিও না। এই নিদ্রার সঙ্গে আমার মহানিদ্রা এনে দাও—আমি সুখে মরবো।"

সাধু আর থাকিতে পারিল না। বলিল—

মা জননি! মা জননি! ঘরে চল মা! উঠ, তোমার ছেলেকে চরণধূলি দাও।

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল। লাবণ্য, হৃষীকেশ, রামতনু ভট্টাচার্য্য ওরফে তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাণপ্রস্থ লইয়া গুরুর আদেশ ক্রমে নিজ নাম বদলাইয়া ছিলেন। সীতানাথ, যোগমায়া, সাধু, জজ বাবু সকলেই প্রাণের আনন্দে ধর্ম্মের জয় গাহিতে গাহিতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় দেবেন্দ্র নাথের পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের ভগ্ন কুটিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শুধু ইনস্‌পেকটার বাবু বলিলেন—আজকের এই মিলন দেখে প্রাণে যে কি সুখ জেগে উঠেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু পুলিসের কাজ এমন পাজি যে সে সুখে ভাল ক'রে যোগদান করতে পেলুম না। আপনারা সকলেই আনন্দে জয় গান গাহিতে গাহিতে সতীর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে চললেন, আর আমি এই পাষণ্ডকে গ্রেপ্তার করে তাহার ও তাহার আত্মীয় স্বজনের কটু ভর্ৎসনা ও গালাগালি শিরে নিয়ে পুলিস-কর্ত্তব্য সাধতে চল্লাম।

এই বলিয়া সেই রাত্রে দেবেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া

পুলিস ইনস্‌পেকটার থানায় চলিয়া গেলেন। জমিদার দেবেন্দ্রনাথের এত আশা সব ফুরাইল।

পরিশিষ্ট

সীতানাথকে পাইয়া হৃষীকেশ আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সংসার করিতেছেন। আদালতের বিচারে দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার ভৃত্যদের মধ্যে যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া সাধুকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই অপরাধ অনুসারে অল্পবিস্তর কারাদণ্ড হইল। দেবেন্দ্রনাথ আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। হর-নাথ এই মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া খালাস পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিল, কিন্তু তথাপি সে অব্যাহতি পাইল না। নাপিত-বৌ ভট্টাচার্য্যদের ডোবার ধারে পতিত হইয়া কোমরে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিল ও তাহাতে চির-জীবনের মত খঞ্জ হইয়া গেল। সে অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। দেবেন্দ্রনাথের ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় না থাকায় জজ বাবু আদালত সাহায্যে তাঁহার পাপ্য টাকার ডিক্রী

করিয়া দেবেন্দ্র নাথের যাবতীয় সম্পত্তি নিলাম ক্রোকে কিনিয়া লইলেন। তাহার পর সেই সমস্ত সম্পত্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুলদেবতা জনার্দ্দন দেবের নামে দেবোত্তর করিয়া হৃষীকেশকে সেবাইত নিযুক্ত করিলেন এবং দেবতার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও আদায় উসুল করিবার জন্য সাধুকে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে অভ্যাগত অতিথিদের সৎকার যাহাতে দেবসেবা হইতে সু-শৃঙ্খলে চলে এবং অনাথ আতুর ব্যক্তিদের সুবন্দোবস্ত হয় তাহারই বিধান করিয়া দিলেন। লাবণ্যদেবী অন্নপূর্ণা রূপে দেবালয়ে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যহ দীন দুঃখীদের অন্নদান বস্ত্রদান প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া ও হাবানিধি সীতানাথকে বুকে লইয়া এই সংসারে স্বামি-সহবাসে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তেওয়ারীর কার্য্যে জজ বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিলেন ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া নিজের জমিদারীর কার্য্যে বাহাল করিলেন। জজ বাবুর যশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার উদারতা বদান্যতা, স্বার্থত্যাগ ও কৃতিত্ব রাজ সমীপে অগোচর রহিল না। অল্পদিনের মধ্যে তিনি হাইকোর্টের বিচার পতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

রামতনু ও যোগমায়া মাত্র তিন দিন কৃষ্ণপুরে রহিলেন। রামতনু মনের সংশয় দূর করিয়াও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল নিবারণ করিয়া যোগমায়ার সহিত একবার পুরুষোত্তম তীর্থে গমন পূর্ব্বক গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে যাইবেন এই সংকল্প করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বে হৃষীকেশ সীতানাথ ও লাবণ্য অশ্রুসিক্ত লোচনে আসিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইলেন।

লাবণ্য সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! এত শীঘ্র আমাদের ছেড়ে যাচ্চেন? বাবা! আবার শ্রীচরণ দর্শন পাবো কবে?

রামতনু—মা! মা! আর মায়ার ডোরে বেঁধো না। আর আসবার ইচ্ছা নাই। তবে জীবন স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভবিষ্যতে যে পুনরায় ক্ষণেকের মিলন হবে না একথা কে বলতে পারে মা?

লাবণ্য—বাবা! বাবা! এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রামতনু—'মা আমার গৃহ লক্ষ্মী। মা জননি! যেখানে থাকি না কেন আমার আশীর্ব্বাদ চিরদিন তোদের উপর থাকবে। মরবার সময় তোদের আশীর্ব্বাদ করতে করতে মরবো। এখন হাসি মুখে পুত্রকে বিদায়

দাও মা। স্বামী পুত্র নিয়ে তুমি সুখী হও। ধর্ম্মে চিরদিন মতি রেখো। রক্ষিত ধর্ম্ম তোমায় সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করবেন। আমি তোদের সুখী দেখে যাচ্চি। আর আমার প্রাণে কোন চাঞ্চল্য নাই—আর কোন কামনা নাই। সময় বয়ে যায়। আজ আত্মীয় স্বজন ও মাতৃভূমির নিকট চিরবিদায় নিয়ে যাচ্চি। শেষ এই আশীর্ব্বাদ করি—তুমি আমার এই পুণ্যের সংসারে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চির বিরাজমানা থেকো। তোমার আদর্শ আমি চিরদিন ভক্তিভাবে হৃদয়ে পুষে রাখবো—তুমি যে আমার জননী—তুমি যে আমার সজীব **পুণ্য-প্রতিমা**!

সমাপ্ত

আমাদের

॥० সংস্করণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

শুভ—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস-সি প্রণীত

রবিদাদা

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ, প্রণীত

ইন্দু

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

স্বর্ণ-মরু

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত

দাদার ঘরে

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত

পুণ্য-প্রতিমা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত

ময়ূরপুচ্ছ

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ছিন্ন-হার

কয়েকটী সুমধুর গল্পের সমষ্টি। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উদীয়মান সুলেখক

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পুণ্যের সংসার

অতুলনীয় সামাজিক উপন্যাস। মূল্য ১॥০

বৃন্দাবনবাবুর আর একখানি উপন্যাস

দেবী ও দানবী

পাপ ও পুণ্যের ছবি পাশাপাশি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সাবিত্রী

৫০ বৎসর পূর্ব্বের একটী গার্হস্থ্য-জীবনের করুণ-কাহিনী (যন্ত্রস্থ)।